বুধবার ■ ১ জানুয়ারি, ২০২৫ ■ ১৬ পৌষ ১৪৩১ ■ ২৯ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি ■ পাক্ষিক পত্রিকা ■ দাম: ৫ টাকা

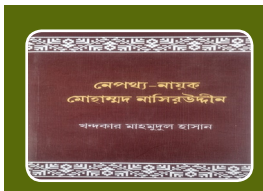

বইপড়া: জীবনীমালা: মোহম্মদ নাসিরউদ্দীন

ন্যায়-অন্যায়: প্রসঙ্গ: আরব দেশের পরিযায়ী শ্রমিক

পাক্ষিক সংবাদ-সাময়িকী
দৃষ্টি
ভিতরে বাইরে

অর্থনীতি: আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও রিবা প্রসঙ্গ

সমাজ: ওয়াকফ আন্দোলন: ছি

Vol: 2 ■ Issue: 1 ■ DRISHTI ■ 1 January 2025 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ Fortnightly News Paper ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ Editor: Saifulla

বাংলাদেশ: আমাদের দায়বদ্ধতা

পদ্মাপারের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেকার সম্পর্কের শীতলতা বাড়তেই আছে: কমার লক্ষণ এখনও তেমন উপলব্ধ নয়। হয়তো আরও অবনতি হতে পারে পরিস্থিতির। যদি তা হয়ও, তাতে আমাদের কী বিশেষ কিছু করণীয় আছে? অনেকেরই মনে হতে পারে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে উলু খাগড়ার আর কী করার থাকতে পারে। কিন্তু সত্যিই কী তাই। বিশেষত, বাঙালি জাতিসত্তার সাপেক্ষে। সেই প্রথম দিন থেকে কঠিনতম পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে বাঙালি জাতিকে। উত্তর ভারতীয় আর্য প্রভুদের আগ্রাসনকে অনেক দিন পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা গেলেও শেষরক্ষা করা যায়নি। অতঃপর গঙ্গা-পদ্মা দিয়ে যত জল গড়িয়েছে তার সঙ্গে বিন্দু বিন্দু রূপে বিমিশ্রিত হয়েছে আমাদের চোখের জল ও শরীরের তাজা রক্ত। দাঙ্গার ভয়াবহতা, উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা, নাগরিকত্ব আইন, ডিটেনশন ক্যাম্প রূপ বীভৎসতা—অসহনীয় বাস্তবতার সীমা পরিসীমা নেই।

আর এখন, এই মুহূর্তের জ্বলন্ত বাস্তব এপার ওপারের মধ্যে চলমানতা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া। এপার থেকে ওপারে যদি বা কিছুটা যাওয়া যাচ্ছে, ওপার থেকে আসা যাচ্ছে না বললেই চলে। অতি আবশ্যকতা রয়েছে এমন কিছু কিছু ক্ষেত্রেই মাত্র অনুমতি মিলছে। নিছক ভালোলাগা থেকে সীমান্তের বেড়া ডিঙানোর তো প্রশ্নই ওঠে না: আবশ্যক সব ক্ষেত্রেও সম্ভব হচ্ছে না এপারে আসা। আসা যে যাচ্ছে না তার প্রমাণ, কলকাতা সহ দেশের অপরাপর হাসপাতালগুলি: সেখানে বাংলাদেশি রোগিদের উপস্থিতিতে বাজার সবসময় গরম থাকতো সেখানে এখন রীতিমতো ভাঁটার টান। এমন ভাঁটার টান কত ক্ষেত্রে কতই তো দেখা যায়; কাজেই এ নিয়ে এত মাথাব্যথার কী আছে? মনে হতে পারে। কিন্তু বিষয়টা যে এত সহজ নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অনেক চেষ্টা করেও অদ্যাবধি বাগে আনা যায়নি বেয়াড়া এই বাঙালি সমাজকে। একে একে কারা না মাথা নত করেছে তাদের কাছে। উত্তর ভারতের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া হল: নৃতাত্ত্বিক ও অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ভাস্বর যে দক্ষিণ ভারতীয় জনগোষ্ঠী, তারাও যেখানে মাথা নত করেছে; করতে বাধ্য হয়েছে সেখানে বাঙালির এই বেয়াড়াপনা নিতান্ত অসহ্য। অনেক চেষ্টা করেও কোনো সুবিধাজনক অবস্থা তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। মাঝে যে একটু সম্ভাবনা-সূর্যের প্রস্ফুটন লক্ষ করা যাচ্ছিল তাও ক্রম নিমীলিত হতে চলেছে। এমন অবস্থায় নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক প্রভুরা। যে মোটা দাগের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির লাঙল চালাতে অভ্যস্ত তারা, বাংলার মাটিতে তা যে ফলপ্রসূ হওয়ার নয়, তা এখন তাদের কাছে বেশ স্পষ্ট। তারা তাই আরও একটু কৌশলী হওয়ার চেষ্টা করছেন; সামনে আনছেন অনুপ্রবেশ ইস্যুকে। বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন দলে দলে মানুষ এদেশে আসছে, বিশেষত এই পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করছে এবং তাদের সিংহভাগই একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের। এই প্রবণতাকে যদি প্রতিহত না করা যায় তবে আগামীতে এ রাজ্যের অপরাপর ধর্ম-সম্প্রদায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বিপন্ন হতে বাধ্য। কাজেই যে কোনো মূল্যে এর প্রতিবিধান জরুরি। আর তা করতে হলে দিল্লির রাজনৈতিক প্রভুদের কোনো বিকল্প নেই। কেননা অন্যেরা, বিশেষত এ রাজ্যের রাজ্য সরকার একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়ে বসে আছেন। এমন অবস্থায় তারাই পারেন, পশ্চিমবঙ্গের অপরাপর ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎকে নিরাপদ রাখতে। কাজেই এখানকার সংখ্যাগুরু সমাজের মানুষ তাদেরকে রাজনৈতিক ও নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করুন। এমনটাই বক্তব্য তাদের।

এই বক্তব্য কতটা অযৌক্তিক বা অমূলক তার কথায় না হয় আপাতত নাই বা যাওয়া হল। এখন যে কথাটা বিশেষ করে বলার; অনুপ্রবেশের ঘটনা যে ঘটছে না তা নিশ্চই নয়। পরিমাণে কম হলেও অনুপ্রবেশ হচ্ছে এবং বর্তমানে তো বটেই, নিকট ভবিষ্যতেও তার সম্পূর্ণ নিরসন হবে না হয়তো। অনুপ্রবেশ তখনই সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হতে পারে, যদি অগ্রগতির মানদণ্ডে কোনোদিন বাংলাদেশ ভারতকে ছাড়িয়ে যায়। তখন এদেশে যে নাগরিক পরিষেবা সহজ সভ্য ওদেশে তার থেকে অতিরিক্ত পরিষেবা পাওয়া যাবে। কাজেই কেউ আর সাধ করে এদেশে আসবে না। কিন্তু তা যে সহজে হওয়ার নয়, তা আমাদের কারোরই অজানা নয়। নিকট ভবিষ্যতে তো বটেই, দূর ভবিষ্যতের সাপেক্ষেও বিষয়টি দূর অস্ত বলেই মনে হয়। কাজেই অনুপ্রবেশের

আলিমুজ্জমান
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

ঘটনা থাকবে। সারা পৃথিবী জুড়ে এর দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হওয়ার নয়।

বিষয়টা তাই অন্য দিক থেকে খতিয়ে দেখতে হবে। অনুপ্রবেশের যে সব ঘটনা ঘটছে সেখানে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যানুপাত কেমন। এখনও পর্যন্ত এমন কোনো পরিসংখ্যানকে সামনে আনা হয়নি, যা থেকে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে এরাজ্যের সংখ্যাগুরুও সমাজের ভবিষ্যৎ সত্যিই সংকটাপন্ন। প্রকৃত সত্যকে গোপন করে মিথ্যা বা অপপ্রচারকেই পাথেয় করা হচ্ছে। আসলে পুরো বিষয়টাই উদ্দেশপ্রণোদিত; রাজনৈতিক ফায়দা লোটার অপচেষ্টা। এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার, এই অপচেষ্টার হাঁড়িকাঠে আমরা গলা দেব কি না? যদি না দিতে চাই তবে এর সমান্তরালে আমাদের করণীয় কী?

এই মুহূর্তে বিষয়টা তেমন প্রকট না হলেও কিছু দিন আগেও বেশ একটু রব উঠেছিল, যে ওদেশের মানুষদের এদেশের চিকিৎসা পরিষেবা পথ রুদ্ধ করাই শ্রেয়। কিন্তু তেমন হলে সব মিলিয়ে যে বিপন্নতা তৈরি হবে তার ফল কী শুভ হবে বলে মনে হয়। ওরা আমাদের দিক থেকে প্রাপ্ত চিকিৎসা পরিষেবা না পেয়ে মরলো কি বাঁচলো; তাতে হয়তো বাহ্যত আমাদের কিছু যায় আসে না: কিন্তু স্বরূপত যে অনেক কিছু এসে যায়, তা কে অস্বীকার করবে। রাজনৈতিক চাপান উতোর যাই থাকুক, সীমান্তের দুই পারের সাধারণ মানুষদের মধ্যে সাধারণ সখ্যতা: ভালোবাসার আদান প্রদান বর্তমান রয়েছে সেই প্রথম দিন থেকে। কোনো দিনই এ বিষয়ে কোনোরকম প্রশ্নচিহ্ন প্রশ্রয় পায়নি। সম্পর্কের সুস্থতা ও নিবিড়তা বজায় রয়েছে বরাবরই। এমন সুসম্পর্কের দৃঢ় প্রাচীরে স্থায়ী ফাঁটল তৈরি হতে পারে এর ফলে।

অশুভ শক্তির একটা ধারা এদেশে ও ওদেশে উভয়ত বহমান ছিল এবং রয়েছে। ওই অশুভ শক্তির বিপরীতে যে শক্তি বরাবরই স্বকীয়তায় ভাস্বর। তাকে বিপন্ন করার ভাবনা কোনোভাবেই প্রশ্রয় পেতে পারে না। তেমন হলে ওই অশুভ শক্তির বাহু আরও শক্ত হবে; তারা আরও ভয়ঙ্করভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে অন্যদের উপর। আর সেক্ষেত্রে অন্য অনেক কিছুর পাশাপাশি সবচেয়ে ধ্বস্ত হবে বাঙালি সংস্কৃতি। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা বাঙালি সংস্কৃতির বহমানতাকে সেভাবে ব্যাহত করতে পারেনি কখনোই। অথচ প্রচেষ্টার কোনো শেষ ছিল না। অখণ্ড বঙ্গদেশ ও বাঙালি সমাজ যে রাজনৈতিক সক্ষমতাকে ধারণ করতো তার ভার বহন করা সহজ হত না সেদিনের সম্ভাব্য ভারতীয় ও পাকিস্তানি রাজনৈতিক প্রভুদের কারোরই। তারা তাই পরিকল্পিত পথেই বাংলাভাগকে অনিবার্য করে তুলেছিল। এবং লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পরেও তারা অস্বস্তির বাঁধন ছিঁড়তে পারছেন সেভাবে। বাঙালিরা ওদের দিনের স্বস্তি ও রাতের নিদ্রার পক্ষে বড়োসড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়ে গেছে। ভয়কে নির্মূল করা যাচ্ছে না কিছুতেই। তাই আজও ওরা সতত তৎপর।

পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ সেদিন সোজা আঙুলে ঘি তোলার খেলায় লেজে গোবরে হয়েছিলেন। কাজেই এখন তারা অনেক বেশি সতর্ক। এবার ওরা কোনো ভুল করবেন না বলেই মনে হয়। ধীরে ধীরে লক্ষ্য পথে এগিয়ে যাবেন তারা। এক্ষেত্রে তাদেরকে ভিতর ও বাইরে থেকে শক্তি যোগানোর লোকের অভাব হবে না। মনে রাখতে হবে, তারা যত লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছাবেন বাঙালির ইতিহাস ও সংস্কৃতি ততই বিপন্ন হবে এবং এই বিপন্নতার সিঁড়িপথেই যথাসময়ে নিজেদের রাজনৈতিক সিদ্ধি অর্জন করবেন এদেশের রাজনৈতিক প্রভুরা। বাঙালি জাতিকে তাদের সুমহান নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে চ্যুত করতে না পারলে ওদের স্বস্তি নেই। ওরা ক্রমশ আরও বেপরোয়া হবেন। ওদের এমন বেপরোয়া অবস্থানের বিপরীতে নিছক সাবধানতা শেষকথা হতে পারে না। আমাদেরকেও তাই আরও অগ্রসর অবস্থান নিতে হবে: দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে সম্ভাব্য সব দিক থেকে।

আমাদের কথা

বর্ষ-২ ■ সংখ্যা-১ ■ ১৬ পৌষ ১৪৩১ ■ ২৯ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

রাষ্ট্রিক জাতীয়তা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য

বাংলায় জাতি বা জাতীয়তা কথাটি বহু মাত্রিক। ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা প্রভৃতি নানা দিক থেকে জাতীয়ত। কথাটি প্রযোজ্য হয়েছে বা হচ্ছে। তবে সেসব কিছুকে ছাড়িয়ে যে বিষয়টা এখন সর্বাধিক প্রাধান্য পাচ্ছে তা হল রাষ্ট্র চেতনা, অন্য অর্থে রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদ। আমরা ভারত রাষ্ট্রের অধিবাসী; সেই অর্থে ভারতীয়। ভারত রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে ভারতীয়দের মধ্যে যে সামষ্টিক চেতনা বর্তমান তাই হল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। এমনি করে ফ্রান্সের অধিবাসীদের সাপেক্ষে ফরাসি জাতীয়তাবাদ, চিনের অধিবাসীদের সাপেক্ষে চৈনিক জাতীয়তাবাদ কথাটা প্রযোজ্য।

একটা সময় ছিল যখন রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদের এই রমরমা অবস্থা ছিল না। তখন বরং ভাষিক, ধর্মীয় ইত্যাদি জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রাধান্য ছিল। বাঙালি-মারাঠি, হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি যেমন। পরে দেশীয় ও বৈশ্বিক নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে অবস্থার পরিবর্তন হয়। বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটে মূলত শিল্প বিপ্লব উত্তর পর্বে। এর আগে কোনো বিশেষ এলাকায় বসবাসকারী একজন ব্যক্তি ওই এলাকার রাজা বা ভূস্বামীর পক্ষ থেকে দাবি করা কর প্রদান করেই সম্পন্ন করতে পারত তার রাষ্ট্রিক দায় দায়িত্ব। রাষ্ট্রও আলাদা করে বিশেষ কোনো দায় স্বীকার করতো না উক্ত ব্যক্তির। বড়োজোর তার জান ও মালের ন্যূনতম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হত। কিন্তু যন্ত্র বিপ্লবের অভিঘাতে আমূল বদলে যায় এই ব্যবস্থাপনা।

যন্ত্রবিপ্লব উত্তর বাস্তবতায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায় বিরাট বিরাট সব কারখানায় কাঁচামালের যোগান নিশ্চিত করা এবং উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করা। আর এর জন্য অনিবার্য হয়ে ওঠে নিত্য নতুন ভূখণ্ডের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন। আর একাজ সুষ্ঠুভাবে করতে হলে রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না সেদিন। তখন ইউরোপের প্রত্যেকটা দেশের মানুষই বাজার দখলের লড়াই এ একে অপরকে পরাস্ত করতে চাইছিল। এই লড়াই এ সামগ্রিক সাফল্য অর্জন করতে হলে ব্যক্তিক বা গোষ্ঠী চেতনার মধ্যে আবদ্ধ থাকলে হবে না, দেশের সব মানুষকে একসূত্রে বাঁধতে হবে; এটা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিল যুযুধান সব পক্ষ এবং এই সূত্রেই পোক্ত হয়েছিল রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

যন্ত্রবিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর কেটে গেছে আরও কয়েক শত বছর। এতদিনেও রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে কোনো রকম ফাঁটল লক্ষ করা যায়নি, বরং উত্তর উত্তর তা দৃঢ়তর হচ্ছে। এক একটি রাষ্ট্রিক জাতিসত্তা সচেষ্ট হচ্ছে আর সবাইকে ছাপিয়ে গিয়ে একমেবাদ্বিতীয়ম বা সর্বেসর্বা হয়ে উঠতে। তারা সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে এমন ভাবে বিন্যস্ত করতে চাইছে, যেখানে তারাই হবে প্রথম ও শেষকথা; অবশিষ্ট বিশ্ব বাধ্য থাকবে তাদেরকে মেনে চলতে। বলা বাহুল্য, এমন মানসিকতা বা ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কোনো কল্যাণকে বহন করে আনতে পারে না; বরং চূড়ান্ত এক অস্থিরতাকে লালন করে এবং এখানেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদ মানুষকে কী উপহার দিয়েছে আর কত কী কেড়ে নিয়েছে, তা নিয়ে আলাদা করে মূল্যায়ন করার দিন এসেছে। আমরা কিছুতেই ভুলে যেতে পারি না, মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বীভৎস বাস্তব যে দু' দুটি বিশ্বযুদ্ধ তা রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদের গর্ভগৃহ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এখন বিশ্বায়নের যুগে গোটা পৃথিবী জুড়ে যে স্নায়বিক যুদ্ধ চলছে তারও মূলে রয়েছে রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদ। রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদ এখন মানুষকে রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করছে না, তাদেরকে দেখা হচ্ছে রাষ্ট্র-যন্ত্রের এক একটা উপাদান বা সংখ্যা হিসেবে।

অপরাপর যে কোনো যন্ত্রের মতো রাষ্ট্র-যন্ত্রকে যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হলে এর সমস্ত উপাদানকে সমান ও একমুখীভাবে ক্রিয়াশীল থাকতে হবে; এক্ষেত্রে কোনো রকম কোনো বিচ্যুতি হলে অন্য সব যন্ত্রের মতো রাষ্ট্রযন্ত্রও বিকল হয়ে যেতে বাধ্য। রাষ্ট্র-প্রভুরা তাই সদা সচেষ্ট রয়েছেন; চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলেছেন। কেউই যাতে এতটুকুও বেগড়বাই করতে না পারে। কারও মধ্যে সামান্য কোনো বিসদৃশ ভাব চোখে পড়লেই প্রবল সক্রিয় হয়ে উঠছেন তারা; কখনো কখনো তাদের সে সক্রিয়তা প্রবলভাবে সীমা ছাড়াচ্ছে। এতে বিড়ম্বনার একশেষ হচ্ছে: নিয়ত পদদলিত হচ্ছে মানবতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি যা কিছু সত্য ও শুভ তার সমস্তই।

এখন রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদের চাকায় সবচেয়ে বেশি করে পিষ্ট করা হচ্ছে মানুষের অর্থনৈতিক অধিকারকে। সম্পদের কেন্দ্রিকরণ আজ ভয়াবহ বাস্তব। একটা শ্রেণির গচ্ছিত ধন সম্পদ সম্ভাব্য সম্ভাব্যতাকেও যেন লজ্জা দিচ্ছে; তারা নিজেরাও জানছে না যে ঠিক কত সম্পদ তাদের কাছে মজুত আছে। একদিকে এই সীমাহীন সম্পদের কেন্দ্রিকরণ; অন্যদিকে রয়েছে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বুভুক্ষু মানুষের ঐকান্তিক আর্তনাদ। দিনের পর দিন না খেতে পাওয়ার তাড়নায় তাড়িত হতে হতে একটা সময়ে এসে আর্তনাদ করতেও অসমর্থ্য হয়ে পড়ছে এই সব মানুষেরা। সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে যাচ্ছে তারা; হারিয়ে ফেলছে প্রতিবাদের ভাষা। অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না।

এই পৃথিবীর যা কিছু সম্পদ তার উপর সমান অধিকার রয়েছে পৃথিবীবাসী প্রত্যেকটি মানুষের। প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুসারে বক্ষ্যমান সম্পদকে অধিকার করবেন, ভোগ করবেন; এমনটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। আর এই প্রাকৃতিক নিয়মেরই অনুবর্তন ঘটে আসছিল এই সেদিন, অর্থাৎ রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদের বাড়বাড়ন্ত না হওয়া পর্যন্ত। তখন তেমন কোনো সমস্যা ছিল না। সম্পদের কেন্দ্রিকরণ তখনও লক্ষ করা যেত, কিন্তু কখনোই তা এমন ভয়াল ভয়ঙ্কর রূপ পেত না। একজন অতিরিক্ত অর্থ ও সম্পদ ভোগ করতে চাইলে অন্যের অধিকার ছিল তা জোর করে দখল করে নেওয়ার। এতে সব মিলিয়ে বেশ একটা সাম্য বজায় ছিল। কিন্তু এখন সে সবই বিনষ্ট হয়েছে এবং এই বিনষ্টির মূলে রয়েছে রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদ।

এখন রাষ্ট্রিক জাতীয়তবাদের চাকায় সবচেয়ে বেশি করে পিষ্ট করা হচ্ছে মানুষের অর্থনৈতিক অধিকারকে। সম্পদের কেন্দ্রিকরণ আজ ভয়াবহ বাস্তব। একটা শ্রেণির গচ্ছিত ধন সম্পদ সম্ভাব্য সম্ভাব্যতাকেও যেন লজ্জা দিচ্ছে; তারা নিজেরাও জানছে না যে ঠিক কত সম্পদ তাদের কাছে মজুত আছে। একদিকে এই সীমাহীন সম্পদের কেন্দ্রিকরণ; অন্যদিকে রয়েছে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বুভুক্ষু মানুষের ঐকান্তিক আর্তনাদ। দিনের পর দিন না খেতে পাওয়ার তাড়নায় তাড়িত হতে হতে একটা সময়ে এসে আতনাদ করতেও অসমর্থ্য হয়ে পড়ছে এই সব মানুষেরা। সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে যাচ্ছে তারা; হারিয়ে ফেলছে প্রতিবাদের ভাষা। অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না।

এই পৃথিবীর যা কিছু সম্পদ তার উপর সমান অধিকার রয়েছে পৃথিবীবাসী প্রত্যেকটি মানুষের। প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুসারে বক্ষ্যমান সম্পদকে অধিকার করবেন, ভোগ করবেন; এমনটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। আর এই প্রাকৃতিক নিয়মেরই অনুবর্তন ঘটে আসছিল এই সেদিন, অর্থাৎ রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদের বাড়বাড়ন্ত না হওয়া পর্যন্ত। তখন তেমন কোনো সমস্যা ছিল না। সম্পদের কেন্দ্রিকরণ তখনও লক্ষ করা যেত, কিন্তু কখনোই তা এমন ভয়াল ভয়ঙ্কর রূপ পেত না। একজন অতিরিক্ত অর্থ ও সম্পদ ভোগ করতে চাইলে অন্যের অধিকার ছিল তা জোর করে দখল করে নেওয়ার। এতে সব মিলিয়ে বেশ একটা সাম্য বজায় ছিল। কিন্তু এখন সে সবই বিনষ্ট হয়েছে এবং এই বিনষ্টির মূলে রয়েছে রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদ।

এখন রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদের চাকায় সবচেয়ে বেশি করে পিষ্ট করা হচ্ছে মানুষের অর্থনৈতিক অধিকারকে। সম্পদের কেন্দ্রিকরণ আজ ভয়াবহ বাস্তব। একটা শ্রেণির গচ্ছিত ধন সম্পদ সম্ভাব্য সম্ভাব্যতাকেও যেন লজ্জা দিচ্ছে; তারা নিজেরাও জানছে না যে ঠিক কত সম্পদ তাদের কাছে মজুত আছে। একদিকে এই সীমাহীন সম্পদের কেন্দ্রিকরণ; অন্যদিকে রয়েছে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বুভুক্ষু মানুষের ঐকান্তিক আর্তনাদ। দিনের পর দিন না খেতে পাওয়ার তাড়নায় তাড়িত হতে হতে একটা সময়ে এসে আর্তনাদ করতেও অসমর্থ্য হয়ে পড়ছে এই সব মানুষেরা। সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে যাচ্ছে তারা; হারিয়ে ফেলছে প্রতিবাদের ভাষা। অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না।

এই পৃথিবীর যা কিছু সম্পদ তার উপর সমান অধিকার রয়েছে পৃথিবীবাসী প্রত্যেকটি মানুষের। প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুসারে বক্ষ্যমান সম্পদকে অধিকার করবেন, ভোগ করবেন; এমনটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। আর এই প্রাকৃতিক নিয়মেরই অনুবর্তন ঘটে আসছিল এই সেদিন, অর্থাৎ রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদের বাড়বাড়ন্ত না হওয়া পর্যন্ত। তখন তেমন কোনো সমস্যা ছিল না। সম্পদের কেন্দ্রিকরণ তখনও লক্ষ করা যেত, কিন্তু কখনোই তা এমন ভয়াল ভয়ঙ্কর রূপ পেত না। একজন অতিরিক্ত অর্থ ও সম্পদ ভোগ করতে চাইলে অন্যের অধিকার ছিল তা জোর করে দখল করে নেওয়ার। এতে সব মিলিয়ে বেশ একটা সাম্য বজায় ছিল। কিন্তু এখন সে সবই বিনষ্ট হয়েছে এবং এই বিনষ্টির মূলে রয়েছে রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদ। রাষ্ট্রের ধারক বাহকরা এখন নিশ্চিত নিরাপত্তার জালে মুড়ে রেখেছেন ওইসব ধনকুবেরদের; যাদের সম্পদের কোনো সীমা পরিসীমা নেই। রাষ্ট্রশক্তি তাদেরকে কেবল নিরাপত্তাই দিচ্ছে না, তাদের শোষণযন্ত্র যাতে আরও মসৃণভাবে চলমান থাকতে পারে তারও সুব্যবস্থা করছে। রাষ্ট্রশক্তির ব্যবস্থাপনা অনুসারেই, আজকের ধনকুবেররা হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ পেয়ে যাচ্ছে এবং যথাসময়ে ওই টাকা আত্মসাৎ করে চম্পট দিচ্ছে বিদেশে; জামাই আদরে প্রতিপালিত হচ্ছে সেখানে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাকে এমনভাবে ব্যাপ্ত করা হয়েছে যাতে জনগণের পক্ষে নির্বাক দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার হচ্ছে না। অথচ অনেক কিছুই তাদের করার ছিল, যদি রাষ্ট্র যন্ত্রটা ওভাবে ওদের উপর চেপে বসে না থাকতো। রাষ্ট্রশক্তি এখন ধনপতিদের ক্রীড়নক মাত্র। তাদেরই ব্যবস্থাপনা অনুসারে প্রবর্তিত হয়েছে তথাকথিত গণতন্ত্র নামক আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। দেশের জনগণ মাত্রই এখন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অংশ বিশেষ। তাদের প্রদত্ত ভোট বা ইচ্ছা মোতাবেকই রাষ্ট্রের কর্নধাররা দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। এমন অবস্থায় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিরোধিতা করা মানে প্রকারান্তরে নিজেরই বিরোধিতা করা। কাজেই অন্য অনেক বিষয়ের পাশাপাশি আধুনিক এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়েও জনগণের দিক থেকে সরব হওয়া যাচ্ছে না সেভাবে। সর্বোপরি, জনগণের সামনে খুড়োর কলের মতো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এক একটা রাষ্ট্রীয় জিগির। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা প্রভৃতি যেমন।

রাষ্ট্রীয় জাতিসত্তার পক্ষে মানুষকে নানা পথে উত্তেজিত করে ও ব্যস্ত রেখে ওই ফাঁক দিয়ে ধনপতিদের অন্য অর্থে ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার লক্ষ্যকে কার্যকর করা এখন রাষ্ট্রশক্তির প্রথম ও প্রধান এজেন্ডা। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্র একই ধারা বহমান।

কাজেই খুব সহজে এখান থেকে মুক্তি নেই আমাদের। এর জন্য করতে হবে বহু ত্যাগ স্বীকার; হয়তো ঝরাতে হবে অনেক রক্তও।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে অন্যায় আজ সংঘটিত হচ্ছে তা কখনো, কোনো অবস্থাতেই চিরস্থায়ী হতে পারে না। অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তবে তার জন্য আবশ্যক দুটি সাপেক্ষ সত্যের সমন্বয়—উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করা এবং সময় হলে সম্ভাব্য সব পক্ষ কে সমন্বিত করে সর্বাত্মকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়া; সর্বোপরি চেতনার গভীরে প্রত্যাশার প্রদীপটিকে সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রজ্জ্বলিত রাখা।

ওয়াকফ আন্দোলন: ছি

ওয়াকফ প্রশ্নে সারা দেশ এখন আলোড়িত। প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন সংখ্যালঘু সমাজের অনেকেই। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজের মধ্যেও প্রতিবাদের আগুনে তপ্ত হওয়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সকলের মধ্যেই যথেষ্ট সক্রিয়তা লক্ষ করা যাচ্ছে। তবে এই সক্রিয়তার ফলাফল কি দাঁড়াবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। আর এই সংশয় দানা বেধেছে রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের অবস্থান ও ভূমিকা সাপেক্ষে।

এখনও পর্যন্ত এ রাজ্যে যারা ওয়াকফ আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছেন বা উঠতে চলেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই প্রায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার দ্বারা তাড়িত। তাঁরা আন্দোলন করছেন; আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠতে চাইছেন তাদের রাজনৈতিক প্রভুর নির্দেশ অনুসারে বা স্বতপ্রণোদিত হয়ে, তাঁকে খুশি করার তাগিদে। রাজনৈতিক প্রভুর কাছে এভাবে মাথা বিকিয়ে দিয়ে বা বন্ধক রেখে কখনো কোনো আন্দোলনকে সফল করা যায় না; যেতে পারে না। এদিকে এমন অসাধ্য সাধন করার জন্যই উঠে পড়ে লেগেছেন তারা।

ওয়াকফ আন্দোলন নিয়ে রীতিমতো যেন একটা প্রদর্শনী চলছে। বিভিন্ন দল ও মত পথের মানুষ তাদের মতো করে আলাদা আলাদা ভাবে মিটিং মিছিলের ডাক দিচ্ছেন এবং গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার লোক জুটিয়ে এনে নিজেদের ক্ষমতা জাহির করার চেষ্টা করছেন। ঠিক ওভাবে না হলেও তাদের কৃতকর্মের সূত্রে বেশ প্রতিপন্ন হচ্ছে যে, তারা আসলে ওয়াকফ সমস্যার প্রেক্ষিতে যত না বিচলিত তার থেকে অনেক বেশি বিচলিত নিজেদের কর্তৃত্বকে ঘিরে। অন্যদের ডাকে লোকসমাগম বেশি হলে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ছেন তারা; বিপরীতক্রমে উল্লসিত হচ্ছেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোকসংখ্যার দৃষ্টিকটু রকমের স্বল্পতার কারণে।

এঁদের কারো মধ্যেই সেই তাড়ন লক্ষণীয় নয়, যা কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোনকে সফল করে তোলার জন্য অত্যাবশ্যক। যাকে বলা হয় ভেস্টেড ইন্টারেস্ট, এরা প্রত্যেকেই কমবেশি তার শিকার। ওয়াকফ আন্দোলনকে সামনে

মীর রেজাউল করিম
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

রেখে তারা রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করতে চাইছেন। সাংসদ থেকে পঞ্চায়েত সদস্য; স্তর ভেদে বিভিন্ন জন তাদের লক্ষ্য কে নির্ধারণ করে নিয়েছেন এবং লক্ষ্য পূরণে প্রয়াসী হয়েছেন।

আপন আপন রাজনৈতিক ভবিষ্যতের লক্ষ্যে সক্রিয় হওয়ার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে: নিশ্চয়ই রয়েছে। কিন্তু তার জন্য বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থকে এভাবে ব্যবহার করার কী মানে থাকতে পারে! ঘটনার পারম্পর্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে, যারা ওয়াকফ আন্দোলনে শরিক হওয়ার জন্য দূর দূরান্তের গ্রাম থেকে শহর কলকাতায় উপস্থিত হয়েছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশ জনই এসব ঘোরপ্যাঁচ বিষয়ে কিছুমাত্র অবগত নন। তারা তাদের স্বাভাবিক সামাজিক দায় থেকে এই আন্দোলনে শরিক হচ্ছেন। এমন সহজ সাধারণ যে মানুষগুলি তাদের ঐকান্তিক আবেগকে এভাবে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে যারা ব্যবহার করতে আগ্রহী তারা বিশেষ ধিককারের যোগ্য।

এখনও পর্যন্ত ওয়াকফ প্রশ্নে, এ রাজ্যের সংখ্যালঘু সমাজের রাজনৈতিক কর্ত্যাব্যক্তিদের যে অবস্থান তা দুর্ভাগ্যজনক। যে কোনো আন্দোলনে সাফল্য ব্যর্থতার প্রশ্নে সর্বোচ্চ নেতৃত্বের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এদিকে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অদ্যাবধি ওয়াকফ আন্দোলনে তাদের মধ্যে থেকে কোনো একটি মুখকে তুলে ধরতে পারেননি। তারা শেষাবধি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে তাদের নেতা হিসেবে নির্বাচন করেছেন; তাঁকেই এই সংকট সাপেক্ষে পরিত্রাতা হিসেবে জ্ঞান করছেন। এর থেকে লজ্জার আর কী হতে পারে।

রাজ্য-মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক অবস্থান যাই হোক না কেন তাঁর ব্যক্তিক অবস্থান কোনো দিনই প্রশ্নচিহ্নের উর্ধ্বে ছিল না। বিজেপির সঙ্গে রাজনৈতিক আঁতাত। মিলিজুলি সরকার গঠন থেকে শুরু করে হাজারও নিদর্শন রয়েছে। এমন অবস্থায় তাঁকে ওয়াকফ আন্দোলনে নেতা হিসেবে নির্বাচন করার থেকে অতিরিক্ত আহাম্মুকি আর কী হতে পারে। তার থেকেও বড়ো কথা এমন আহাম্মুকির অংশিদার যারা তাদের সম্পর্কে সমাজের সাধারণ মানুষের ভূমিকা বা অবস্থান কী হওয়া উচিত।

ওয়াকফ প্রশ্নে দিল্লির ক্ষমতাসীন দল যে অবস্থান নিয়েছেন তাদের মতো আরও অনেকের সাপেক্ষে তার একটা গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। ওয়াকফ রূপ বিরাট সম্পত্তি, এখনও তাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এমন সম্পত্তির উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ তৈরি হলে যে অত্যন্ত লাভ হবে তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই তারা তাদের জায়গায় ঠিকই আছেন। এখন কথা হল, এর বিপরীতে মুসলমান সমাজের কী করণীয় ছিল এবং তারা করছেন কী। সমাজের মধ্যে থেকে রাজ্যস্তরের এক একজন নেতা নির্ধারণ করে নেওয়া ও ওই পথে কেন্দ্রীয় নেতাকে বেছে নেওয়া এবং তাঁকে সামনে রেখে সর্বোচ্চ প্রতিরোধ গড়ে তোলা—এটাই তো শ্রেয় পথ। এমন শ্রেয় পথে পা রাখাতে কোথাও কোনো সমস্যা রয়েছে বলে তো মনে হয় না। কিন্তু তাই যদি না হবে, তবে কেন তা করা হচ্ছে না।

হতে পারে বিভিন্ন রাজ্যের সংখ্যালঘু নেতৃত্ব তাঁদের মধ্যে থেকে একজনকে নেতা নির্ধারণ করে নিতে পারছেন না, অনুরূপ ভাবেই ব্যর্থ হচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্তরের নেতা মনোনীত করতেও। এই ব্যর্থতা, এমনিতে যতই বেদনাদায়ক হোক না তার দহনে দগ্ধ হওয়া তুলনায় অনেক সহজ। সেক্ষেত্রে তবু সম্ভাবনা থেকে যায়, আজ না হলেও একদিন অনুকূল অবস্থা তৈরি হবে; যেদিনে ঘনীভূত সংকটের প্রেক্ষিতে অগণিত মানুষ ও তাদের নেতৃত্ব সর্বাত্মকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবেন; অর্জন করতে পারবেন কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। কিন্তু তার পরিবর্তে এটা যা করা হচ্ছে তার সবটাই ঋণাত্মক; এটা শুধু ক্ষতিকারক নয়; অত্যন্ত অসম্মানজনক; জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ভয়ঙ্করতম বিষয়। এভাবে চলতে থাকলে সাধারণ মানুষ খুবই বিভ্রান্ত হবেন এবং একসময় সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়বেন। তখন হাজার চেষ্টা করেও আর তাদেরকে সেভাবে জাগানো যাবে না। আর তাদের ঐকান্তিক সমর্থন ছাড়া কোনো আন্দোলনই সফল হবে না।

আজ তাই সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে। সতর্ক হতে হবে সম্ভাব্য সব পক্ষকে। লক্ষ রাখতে হবে, ভালো না করতে পারলেও আমাদের কাজের মধ্যে দিয়ে সামষ্টিক ক্ষতির বহর যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির যূপকাষ্ঠে সামগ্রিক স্বার্থকে বলি দেওয়া চলবে না কিছুতেই। যারা এমন কাজের কাজী তাদেরকে প্রত্যাখান করতে হবে প্রথমেই। তাদের সম্পর্কে কোনো দুর্বলতা বা তঞ্চকতাকে নিজেদের মধ্যে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। তেমন হলে সমূহ সর্বনাশ হবে।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই; চলতি ওয়াকফ আন্দোলনে বর্তমান ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহায়তা নিতে হবে। এবং এই সহায়তা নেওয়া থেকে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও বাদ যাবেন না। বাদ তো যাবেনই না; বরং তাঁর থেকে অনেক বেশি সহায়তা গ্রহণ করা যেতেই পারে। বিশেষত, এই সহায়তা দানের ক্ষেত্রে তাঁর দিক থেকে যখন রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়েছে। এ রাজ্যের মুসলিম সমাজের সমর্থন ব্যতিরেকে তাঁর পক্ষে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব নয়, এটা তিনি ভালো করেই জানেন এবং সে কারণেই বিষয়টার প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি দিয়েছেন। এই দৃষ্টি দেওয়াটা ইতিবাচক। এমন ইতিবাচকতাকে আরও ইতিবাচক করে তোলার দায়ভার বহন করতে হবে মুসলমান সমাজকে; সমাজের নেতৃবৃন্দকে।

তাঁরা একথা কিছুতেই ভুলে যেতে পারেন না, যে নিজেদের বাঁশিটা অন্যের কাছে বন্ধক রেখে যথার্থ গাইয়ে হওয়া যায় না। ভাড়া করা মা হাজার চেষ্টা করেও প্রকৃত মায়ের মতো করে কাঁদতে পারেন না। নিজেদের ভালো মন্দটা আজ নিজেদের মতো করে নিজেদেরকেই বুঝে নিতে হবে; তার জন্য সুবিধামতো ভাবে ব্যবহার করতে হবে সম্ভাব্য পক্ষকেই; কারও দ্বারা কিছুতেই ব্যবহৃত হলে চলবে না। যদি এমন হয়; ব্যবহৃত হওয়াই আপাতত আমাদের অনিবার্য ভবিতব্য, তবে ওই ব্যবহৃতও হতে হবে সম্পূর্ণ মাত্রায় সচেতন থেকে। সেক্ষেত্রে অপেক্ষা করতে হবে উপযুক্ত সময়ের জন্য। যখন সময় আসবে তখন ভাস্বর হতে হবে স্বকীয়তায়। এসব না করে নিছক ব্যক্তিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সামষ্টিক স্বার্থকে বলি দেওয়া চলে না কিছুতেই। যারা এসব করছেন আমরা তাদের উদ্দেশ্যে নিংড়ে দিলাম আমাদের নিবেদন। তারা যেন ব্যক্তিগত বা যাবতীয় ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সামষ্টিক ও জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণে যত্নশীল হন।

রাজ্য-মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক অবস্থান যাই হোক না কেন তাঁর ব্যক্তিক অবস্থান কোনো দিনই প্রশ্নচিহ্নের উর্ধ্বে ছিল না। বিজেপির সঙ্গে রাজনৈতিক আঁতাত। মিলিজুলি সরকার গঠন থেকে শুরু করে হাজারও নিদর্শন রয়েছে। এমন অবস্থায় তাঁকে ওয়াকফ আন্দোলনে নেতা হিসেবে নির্বাচন করার থেকে অতিরিক্ত আহাম্মুকি আর কী হতে পারে। তার থেকেও বড়ো কথা এমন আহাম্মুকির অংশিদার যারা তাদের সম্পর্কে সমাজের সাধারণ ভূমিকা বা অবস্থান কী হওয়া উচিত। ওয়াকফ প্রশ্নে ক্ষমতাসীন দল যে অবস্থান নিয়েছেন তাদের মতো আরও অনেকের সাপেক্ষে তার একটা গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

সমাজ

আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও রিবা প্রসঙ্গ

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আছে। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা হল দেশে অর্থের চলাচলের একটি নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি এবং মূল্যবৃদ্ধির কারণে অর্থের যে অবমূল্যায়ন হয় সেটাকে সাধ্যমতো মাত্রায় প্রশমন করার একটি পদ্ধতি। কিছু লোক ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন; তাদেরকে বলা হয় জমাদার বা আমানতকারী। ব্যাঙ্ক জমাদারদের দ্বারা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা কিছু লোককে বা সংস্থাকে বা সরকারকে বিশেষ কোনো কাজে বা ব্যবসা করার জন্য দেয়। ব্যবসায়ী সংস্থা বা কোম্পানিগুলো ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া টাকা ব্যবসায় লাগিয়ে যা লাভ করে তার একটা অংশ ব্যাঙ্ককে ফেরত দিয়ে থাকে। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, ব্যাঙ্ক প্রতি এক'শ টাকায় ৩০ থেকে ৪০ টাকা লাভ হিসাবে ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পায়। সেই লাভের টাকা থেকে ব্যাঙ্কের নিজের ব্যবসা চলে। অর্থাৎ, অফিস ভাড়া, কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি এবং নিজস্ব লাভ। এগুলো নিশ্চিত করার পরে লাভের সামান্য অংশ প্রতি এক'শ টাকায় মাত্র ২ বা ৩ টাকা জমাদার বা আমানতকারীকে দেওয়া হয়। কারণ, আমানতকারীর টাকায় ব্যবসা করেই তো ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ী লাভ করছে। কিন্তু, আমানতকারীর প্রতি অন্যায়টা কতটা মারাত্মক। যার টাকার উপরে ব্যাঙ্কের ও ব্যবসায়ীর ব্যবসা টিকে আছে তার বা তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে লভ্যাংশের শতকরা মাত্র ২ থেকে ৩ টাকা; আর অন্যেরা পাচ্ছে শতকরা ৩০ থেকে ৪০ টাকা। সুতরাং, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা গরিব সাধারণ জনগণকে শোষণ করে ধনী ব্যবসায়ীদের লাভ করিয়ে দিচ্ছে ও নিজেরাও লাভবান হচ্ছে। অর্থাৎ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় সাধারণভাবে জমাদার ব্যাঙ্ক থেকে বেশি কিছু তো পায় না, বরং ব্যাঙ্ক জমাদারদের ন্যায্য পাওনার বড়ো অংশ অনৈতিকভাবে নিয়ে নেয়।

আমাদের দেশ সহ পৃথিবীর অনেক দেশেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার্য ও

মুহম্মদ আফসার আলী
অধ্যক্ষ, খুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ, কলকাতা

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং পরিষেবার আর্থিক দাম বা মূল্য বেড়েই চলেছে। এটাকে বলে মূল্যবৃদ্ধি। এক বছর আগে এই সময় যে জিনিসটা এক'শ টাকায় পাওয়া যেত, এখন সেই জিনিসটাই কিনতে হলে এক'শ টাকার বেশি দিতে হবে। এক বছরে এই যে এক'শ টাকা দামের জিনিসটার উপরে যতটা দাম বেড়েছে সেটাই হল মূল্যবৃদ্ধির শতকরা হার। আমাদের দেশে মূল্যবৃদ্ধির শতকরা হার সাধারণত ৮ থেকে ১০ এর মধ্যে থাকে। অর্থাৎ, গত বছর যে জিনিসটা ১০০ টাকায় কেনা যেতো, এখন এক বছর পরে সেই জিনিসটা কিনতে ১০৮ থেকে ১১০ টাকা খরচ করতে হয়। অর্থাৎ, দেশে ১০০ টাকার দাম গত বছরের তুলনায় ন্যূনতম ৮ টাকা কমে গেছে। আজকের ১০০ টাকার নোটটি গত বছরের ৯২ টাকার সমতুল মূল্যের হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলে, কোনো ব্যক্তি গত বছর ১০০ টাকা ব্যাঙ্কে রেখে থাকলে আজ যদি ব্যাঙ্ক তাকে ১০০ টাকাই ফেরত দেয় তাহলে সেই জমাদারের অন্তত ৮ টাকা ক্ষতি হলো। জমাদারের ক্ষতি না করতে হলে ব্যাঙ্ক দ্বারা জমাদারকে প্রতি ১০০ টাকা জমার বদলে অন্তত ১০৮ টাকা ফেরত দিতেই হবে। অন্যথায় জমাদারের টাকা বাস্তবে দিন দিন কমতেই থাকবে এবং একসময় নিঃশেষ হয়ে যাবে।

এখন কথা হলো, জমাদারের টাকাটা যতদিন ব্যাঙ্কে ছিল ততদিনে টাকাটার যে পরিমাণ অবমূল্যায়ন হয়েছে, ব্যাঙ্কের দ্বারা জমাদারকে দেওয়া সেই তথাকথিত 'অতিরিক্ত' পরিমাণ এই অবমূল্যায়নের চেয়ে কি বেশি। উত্তর হলো, নিশ্চিতভাবেই নয়। ব্যাঙ্ক জমাদারকে দেয় প্রতি একশো টাকাতে মাত্র ২ থেকে ৩ টাকা, আর টাকার অবমূল্যায়ন শতকরা ন্যূনতম ৮ টাকা। সুতরাং, বাস্তব সত্য হলো, ব্যাঙ্কে টাকা রেখে জমাদারের টাকা আসলে কমেছে। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক জমাদারের টাকার একটা বড়ো অংশ, যেটা প্রতি একশো'য় ন্যূনতম ৫ থেকে ৬ টাকা (অবমূল্যায়নের ন্যূনতম পরিমাণ বিয়োগ ব্যাঙ্কের দ্বারা জমাদারকে 'অতিরিক্ত' হিসেবে দেয়) আসলে নিয়ে নিয়েছে। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো, জমাদার ব্যাঙ্ক থেকে অতিরিক্ত কোনো টাকাই পায় না; বরং ব্যাঙ্ক সাধারণ জমাদারদের কাছ থেকে প্রতি একশো টাকায় ন্যূনতম ৫ থেকে ৬ টাকা প্রতি বছর নিয়ে নেয়। এখন দেখা যাক, জমাদার ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন, এর মানে কি ব্যাঙ্ককে তিনি ঋণ দিয়েছেন? নাকি ব্যাঙ্ক জমাদারের কাছে ঋণ চাইতে এসেছিল। কোনোটাই নয়। ঋণী লেন-দেনে ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার কাছে টাকা চায়। আর, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় জমানার স্বেচ্ছায় নিজের টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখতে যান। সুতরাং, ব্যাঙ্কে টাকা রাখা ঋণের ব্যাপার নয়। এবার প্রশ্ন হলো, ইসলামে যেটাকে রিবা বলেছে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা জমাদারকে যে সামান্য তথাকথিত 'অতিরিক্ত' অর্থ দেয় সেটাকে কি সেই রিবা বলা যাবে। রিবার ক্ষেত্রে প্রথম শর্ত হলো ঋণী লেন-দেন; দ্বিতীয় শর্ত, ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার আর্থিক অসহায়তার সুযোগ নেওয়া এবং তৃতীয় শর্ত হলো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা।

উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, ব্যাঙ্কে টাকা রাখা ঋণী লেন-দেন নয়। ব্যাঙ্কে টাকা রাখা কোনোভাবেই ব্যাঙ্কের আর্থিক অসহায়তার সুযোগ নেওয়ার ব্যাপার নয়। বরং এখানে ব্যাঙ্কই জমাদারকে আর্থিকভাবে শোষণ করে। সুতরাং, ব্যাঙ্কে টাকা রাখা এবং ব্যাঙ্কের দ্বারা সামান্য তথাকথিত 'অতিরিক্ত' অর্থ জমাদারকে দেওয়া রিবার মধ্যে পড়ে না।

মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকে আছেন যারা নিজের টাকা ব্যাঙ্কে রাখেন, কিন্তু ব্যাঙ্ক তাকে যে সামান্য পরিমাণ তথাকথিত 'অতিরিক্ত' টাকা দেয় সেটা তারা ইসলামে নিষিদ্ধ রিবা মনে করে আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করে দেন বা কোনোভাবেই ব্যবহার করেন না। অথচ এদিকে তার প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজন বা বৃহত্তর সমাজ অর্থাভাবে শত সমস্যায় ভুগছে। অনেকে আবার সেই রিবার ভয়ে টাকা ব্যাঙ্কেই রাখেন না; বাড়িতে গচ্ছিত রাখেন। ফলে নিরবচ্ছিন্নভাবে মূল্যবৃদ্ধির কারণে তার টাকার মূল্য ক্রমাগত কমে যায় এবং নোটবন্দির মতো সরকারি নানা সিদ্ধান্তের ফলে বৈধভাবে এবং কষ্টসাধ্য পথে উপার্জিত পুরো টাকাটাই আইনত 'কালো টাকা' হিসাবে পরিগণিত হয়। টাকার মালিক রাতারাতি নিঃস্ব প্রায় হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে।

একটি পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয়েছে, বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক সমূহে কয়েক হাজার কোটি টাকা গচ্ছিত রয়েছে, যা আমানতকারী মুসলমানদের আমানতের উপর 'অতিরিক্ত দেয়' স্বরূপ। এই টাকা ব্যবহার করে গরীব মানুষদের দুঃখমোচন থেকে শুরু করে কত সামাজিক কাজই না করা যেতে পারতো। কিন্তু কিছুই করা হচ্ছে না।

রিবা এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারনার অভাবে মুসলিমরা অন্যান্য সম্প্রদায়দের তুলনায় দিন দিন আর্থিকভাবে দুর্বল হয়েই চলেছে। পিছিয়ে পড়ছে নানা ক্ষেত্রে। এটা চলতে পারে না; এর নিরসন হওয়া অতি জরুরি। তা না হলে আরও দুরবস্থা অপেক্ষা করছে মুসলমান সমাজের জন্য। ইসলামে এমন কোনো বিষয়কে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি, যার কারণে সময়ের সঙ্গে তাল মিলাতে না পেরে মুসলমান সমাজকে পিছিয়ে পড়তে হবে। এক্ষেত্রে সমাজে যা কিছু সমস্যা দানা বাঁধছে তার মূলে রয়েছে ইসলাম সম্পর্কে ভাবনার সীমাবদ্ধতা। সংকীর্ণ বা বদ্ধমূল কোনো ভাবনা থেকে ইসলামকে ধারণ ও লালন করতে গিয়েই এই সমস্যা হচ্ছে। আজ তাই নতুন করে উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা এবং ইসলাম নির্দেশিত রিবা বিষয়ে সর্বাত্মক তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। একজন ইমানদার হিসেবে আমরা কেউই আল্লাহতালাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ রিবা-কে সমর্থন করতে পারিনা। কিন্তু রিবা-র ভয়ে ভীত হয়ে ব্যাঙ্ক প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা, যা ইসলামে নিষিদ্ধ না হতে পারে তাকে বর্জন করা কোনোভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়।

এ বিষয়ে ইতিপুর্বেও আলোচনা হয়েছে এবং আমাদের বাংলা ভাষাতেও কম আলোচনা হয়নি। মুহম্মদ আকরম খাঁ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেদিন তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যকে ততোধিক যুক্তিপূর্ণ পথে খণ্ডন করতে না পেরে তাঁকে কাফের অভিধায় ভূষিত করেছিলেন অনেকেই। মুসলমান সমাজের এই এক বিরাট ব্যাধি। ধর্মীয় বিষয়ে তথাকথিত অপছন্দের কোনো কথাকে যুক্তিযুক্ত ভাবে খণ্ডন করতে না পারলেই আমরা বক্তা মহাশয়কে কাফের বলে আখ্যায়িত করে অদ্ভুত মানসিক তৃপ্তি অনুভব করি। এমন ধ্বংসাত্মক পরিতৃপ্তি একটা জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কাজেই সতর্ক হওয়ার সময় হয়েছেঃ সতর্ক হতেই হবে। অসহিষ্ণু বা মারমুখী না হয়ে স্থিরচিত্তে, গভীর প্রজ্ঞা সহযোগে বিচার করে দেখতে হবে সমস্ত কিছুকে।

আমাদের দেশ সহ পৃথিবীর অনেক দেশেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং পরিষেবার আর্থিক দাম বা মূল্য বেড়েই চলেছে। এটাকে বলে মূল্যবৃদ্ধি। এক বছর আগে এই সময় যে জিনিসটা এক'শ টাকায় পাওয়া যেত, এখন সেই জিনিসটাই কিনতে হলে এক'শ টাকার বেশি দিতে হবে। এক বছরে এই যে এক'শ টাকা দামের জিনিসটার উপরে যতটা দাম বেড়েছে সেটাই হল মূল্যবৃদ্ধির শতকরা হার। আমাদের দেশে মূল্যবৃদ্ধির শতকরা হার সাধারণত ৮ থেকে ১০ এর মধ্যে থাকে। অর্থাৎ, গত বছর যে জিনিসটা ১০০ টাকায় কেনা যেতো, এখন এক বছর পরে সেই জিনিসটা কিনতে ১০৮ থেকে ১১০ টাকা খরচ করতে হয়। অর্থাৎ, দেশে ১০০ টাকার দাম গত বছরের তুলনায় ন্যূনতম ৮ টাকা কমে গেছে।

অর্থনীতি

প্রসঙ্গ: আরব দেশের পরিযায়ী শ্রমিক

লঙ্কায় সোনা সস্তা, কথাটার সঙ্গে কমবেশি পরিচয় রয়েছে আমাদের মধ্যে অধিকাংশ জনের। এটা একটা, প্রবাদ বাক্যের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রবাদ বাক্যের বাস্তবতা কতটা। আদতেও লঙ্কায় সোনা সস্তা বা আগে কখনো সস্তা ছিল কিনা, এসব আমরা জানিনা। তবে এটা নিশ্চিত করে জানি যে, একটা সময়ে পরিযায়ী শ্রমিক রূপে আরব দেশে কাজ করতে যাওয়া ও হাতে সোনা পাওয়া একই বিষয় ছিল। তখন আরব দেশে বেশ কয়েক বছর কাজ করে দেশে ফেরার পর এক জন অতি সাধারণ শ্রমিকও বেশ একটু সম্পন্ন মানুষে পরিণত হতেন। জমানো টাকায় জমি-জমা, বাগান-পুকুর প্রভৃতি পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্রয় করা যেতে পারতো।

সাইফুল্লা

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

এখন কিন্তু অবস্থার সম্পূর্ণ বদল হয়েছে। এখন সেদেশে কাজ করে আর সেই সুখ নেই। সুখ তো নেই, বরং দুঃখের সীমানা সীমা ছাড়িয়েছে।

২০২৩ সালে হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে আরব দেশ সমূহের মধ্যে রাজাধিরাজ সৌদি আরব সেখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করার সুযোগ হয়েছিল এবং সেইসূত্রে অবকাশ হয়েছিল এখানকার পরিযায়ী শ্রমিক, বিশেষত যারা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছে তাদের সঙ্গে আলাপ ও কুশল বিনিময় করার। এই আলাপচারিতার আমরা এমন কিছু বিষয় অবগত হই যা খুবই উদ্বেগজনক। এখন ওখানে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে অদক্ষ শ্রমিক রূপে কাজ করে সুস্থভাবে জীবনাপন করাই অত্যন্ত দুরূহ। কঠোরতর পরিশ্রম করলে তবেই। খেয়ে পরে দু পয়সা কামিয়ে বাড়ি করা সম্ভব।

ঘটনার ইতিবৃত্ত এক্ষেত্রে এইরকম। তখন ওদেশে কাজের লোকের বড়োই অভাব ছিল। তাই যে কোনো ধরণের কাজ করেই যথেষ্ট পারিশ্রমিক পাওয়া যেত। কিন্তু এখন ডাল ছাড়া বাঁদর বেশি। অর্থাৎ যত না কাজের লোকের আবশ্যকতা রয়েছে কাজ করতে ইচ্ছুক লোকের পরিমাণ তার থেকে অনেক বেশি। এমন হলে অবস্থা যা হওয়ার ওখানেও তাই হচ্ছে। কোনোরকম কোনো ব্যতিক্রম লক্ষ করা যাচ্ছে না। আমাদের দেশ সহ এমন অজস্র দেশ রয়েছে যেখানে শ্রমিকের পারিশ্রমিক দিনে দিনে বাড়ে: পরিমাণে কম হলেও কিছু না কিছু অন্তত বাড়ে। ওখানে কিন্তু তা হয়না। ওখানে বরং অনেক ক্ষেত্রে পারিশ্রমিকের পরিমাণ রীতিমতো কমেও যায়। মক্কা মদিনায় সাফাইকর্মীদের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে। এই কয়েক বছর আগেও ওখানে যারা কাজ করতেন তাদের গড় বেতন ছিল থাকা খাওয়া সহযোগে মাসে ছয় থেকে আট শত রিয়ালের মতো। অর্থাৎ ভারতীয় টাকায় পনেরো থেকে কুড়ি হাজার টাকা। কিন্তু এখন তাদের গড় বেতন তিন থেকে চার শত রিয়াল, ভারতীয় টাকায় দশ থেকে পনেরো হাজার।

একদিকে যেমন পারিশ্রমিক কমছে অন্য দিকে তেমনি থাকার, বিশেষত খাদ্য খাবারের মানেও সাংঘাতিক রকমের অবনমন ঘটানো হচ্ছে। যে মানের খাবার দেওয়া হচ্ছে তা ভক্ষণ করে কারও পক্ষেই সুস্থ স্বাভাবিক থাকা এবং দিনের পর দিন পরিশ্রম সাধ্য কাজ করে যাওয়া সম্ভব নয়। এদিকে এইসব শ্রমিকরা যে বাইরে থেকে নিজেদের পছন্দের মতো কিছু খাবার কিনে খাবে তারও উপায় নেই। এদেরকে রাখা হয় লোকালয় থেকে অনেক দূরে মরুভূমির মধ্যে কোনো ক্যাম্পে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট বাসে করে সেখান থেকে মক্কা-মদিনা চত্বরে আনা হয় এবং সময় মতো ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আর ডিউটি আওয়ার্সে নিজেদের মতো করে খাওয়া দাওয়া করার কোনো সুযোগ নেই। এরা সাধারণভাবে আলাদা করে তখনই কিছু খেতে পায় যখন তীর্থযাত্রীরা অনুগ্রহ পরবশ হয়ে তাদের হাতে কিছু খাদ্য-খাবার তুলে দেন। কেউ কেউ খাদ্য খাবার না দিয়ে নগদ টাকাও দিয়ে থাকেন। এই নগদ টাকা তাদের কাছে উপরি পাওনা স্বরূপ।

বস্তুত, কিছুটা উপরি পাওনা রয়েছে বলেই এই সব পরিযায়ীরা শেষাবধি কষ্ট করে হলেও কাজে বহাল থাকতে পারে। তা না হলে, কিছুতেই তা করা সম্ভব হত না। ভাবতে অবাক লাগে, লোকে অনুগ্রহ করে দুই টাকা, এক টাকা করে এদের হাতে তুলে দিচ্ছে আর তার সুযোগ নিচ্ছে কোটিপতি সব কোম্পানির মালিকরা। কম পারিশ্রমিক দিয়েও কাজের লোকের অভাব হচ্ছেনা, কাজেই সম্পূর্ণ বেপরোয়া তারা। করতে হয় করো, না হলে বিদায় হও।

বিদায় যে হবে তারও কিন্তু কোনো উপায় নেই। এইসব শ্রমিকদের প্রত্যেকে তাদের নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে কঠিন শর্তে আবদ্ধ। তিন থেকে পাঁচ বছরের চুক্তি বয়েছে কোম্পানির সঙ্গে। এর আগে কেউ কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে পারবে না। এদের পাসপোর্ট জমা থাকে কোম্পানি কর্তাদের কাছে। কেউ যদি বেপরোয়া হয়ে কাজ ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় তবে শেষাবধি তার পাসপোর্ট তাকে ফিরেয়ে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তার দেশে ফেরার ব্যাপারে কোনোরকম কোনো দায়িত্ব কোম্পানি নেয় না। নিজস্ব সঞ্চয় থেকে বিরাট অঙ্কের বিমান ভাড়াসহ আরও অনেক খেসারত দিয়ে তবে দেশে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়।

যারা খেজুর বাগান পরিচর্যা বা উট প্রতিপালনের কাজ করে তাদের পারিশ্রমিক তুলনায় একটু বেশি, আটশো থেকে হাজার রিয়ালের মতো; কিন্তু তাদেরও অবস্থা আরও সঙ্কটজনক। মক্কা মদিনা চত্বরে যারা কাজ করে তাদের যে উপরিপাওনা জোটে এদের তার কানাকড়িও জোটে না। লোকালয় থেকে অনেক অনেক দূরে এক একটা খেজুর বাগান সেখানে সাধারণ মানুষের আনাগোনা একেবারেই নেই। কাজেই উপরিপাওনা জোটার প্রশ্ন ওঠে না। নিঃসন্দেহে আরব দেশের খেজুর অত্যন্ত সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর। কিন্তু খেজুর বাগান সমূহ মোটেই তা নয়।আলাদা করে আকৃষ্ট হওয়ার মতো কোনো সৌন্দর্য বাগানের মধ্যে নেই। বড়ো বড়ো সব বাগান, ধূষর মাটি, একঘেয়েমির একশেষ হয় এখানে থাকার ক্ষেত্রে। বছরের পর বছর শ্রমিকদের এই নিরানন্দ পরিবেশে অতিবাহিত করতে হয়। একবার বাগানে প্রবেশ করার পর এখান থেকে বার হওয়ার সুযোগ মেলে না বললেই চলে: বিশেষ কোনো সুবিধা অসুবিধা ব্যতিরেকে। যারা উট প্রতিপালনের কাজ করেন তাদের অবস্থা তো কহতব্য নয়। সভ্য সমাজের থেকে অনেক দূরে, গভীর মরুভূমির মাঝে পশুদের সঙ্গে যাযাবর মানুষের মতো করে জীবন যাপন করতে হয় তাদের। যারা স্বভাবত যাযাবর তাদের কোনো সমস্যা হওয়ার নয়; কিন্তু গ্রাম জীবনে নিবিড় পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে অভ্যস্ত কারও পক্ষে এটা যে কতখানি দুঃসহ তা সহজেই অনুমেয়।

বর্তমান সৌদি আরব সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের সাপেক্ষে নানা আইন কানুন প্রবর্তন করেছে এবং এর অধিকাংশই শ্রমিক স্বার্থের পরিপন্থী। শ্রমিক হিসেবে ওদের কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হয় এবং তার জন্য প্রথমেই সরকারি তহবিলে জমা করতে হবে দুই থেকে তিন হাজার রিয়াল, ভারতীয় টাকায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি। এবং এখানেও শেষ নয়। প্রত্যেক শ্রমিকের সাপেক্ষে এক একজন অভিভাবক থাকতে হবে। এবং তাদেরকে হতে হবে অবশ্যই ওদেশের নাগরিক; অন্য কারও অভিভাবকত্ব মান্য নয়। এই অভিভাবক সংগ্রহ করার জন্যও সরবরাহ করতে হয় বেশ মোটা অঙ্কের অর্থ। এই খরচা রেকারিং অর্থাৎ মাসে মাসে করে যেতে হবে। মাসের শেষে উক্ত প্রভুর হাতে তুলে দিতে হবে মোট ইনকামের দশ থেকে বারো শতাংশ। এ একেবারে রাজকীয় ব্যবস্থাপনা। কোনো রকম কোনো মাথা ব্যথা নেই; কেবল কয়েকজনের অভিভাবকত্বকে স্বীকার করে নেওয়া; তাতেই নিয়মিত ভাবে ফুলে ফেঁপে উঠবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। আর এসব কিছুই করা হয়েছে দেশের নাগরিকদের খুশি করার জন্য; তাদেরকে আরও। বেশি করে পাইয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজতন্ত্রে রাজাকে সবসময় তটস্থ থাকতে হয়। প্রজা অসন্তোষ যেন মাত্রা না ছাড়ায়। সৌদি রাজপরিবার সেক্ষেত্রে আরও সতর্ক নাগরিকদের প্রত্যাশা থেকেও অতিরিক্ত কিছু পাইয়ে দিতে সচেষ্ট তারা; তার জন্য পরিযায়ী শ্রমিক বা ওই শ্রেণির লোকের গলায় গামছা দিতে তাদের কোনো দ্বিধা নেই।

আমাদের দেশে শ্রমিকমাত্রেরই ছুটি আছে; সপ্তাহে অন্তত একদিন। এখানে এমন সাপ্তাহিক ছুটির ধারণা বলবৎ নয়। বিশেষ কারণে কেউ ছুটি করতে পারে তবে ওই ছুটির পরিমাণ সামান্য ও অতিরিক্ত ছুটি হলেই কেটে নেওয়া হবে বেতন। তুলনায় কিছুটা ভালো অবস্থায় রয়েছেন ওইসব শ্রমিকরা, যারা বিভিন্ন আবাসনে বা দোকানে কাজ করেন। এরা কমবেশি মানবিক পরিবেশে প্রতিপালিত হন। নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে অবসর সময়ে অন্যত্র কাজ করে অতিরিক্ত আয় রোজগারের সুবিধাও তারা উপভোগ করে থাকে। এতক্ষণ যাদের কথা বলা হল তারা সবাই প্রায় ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে কাজ করতে গেছে সেখানে। এদের বাইরেও ওদেশে অগ্রণ শ্রমিক রয়েছে যারা মুখ্যত আফ্রিকা মহাদেশ থেকে আগত এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই আবার সুদানি।

ন্যায়-অন্যায়

মক্কা-মদিনা চত্বরে কর্মরত শ্রমিক যাদের দিয়ে কথা শুরু করেছিলাম তাদের অনুষঙ্গে ফিরে আসা যাক। এর আগে এইসব শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যে বীন লাদেন কোম্পানি, তারা শ্রমিকদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন; তাদের ভালোমন্দের দিকে কিছুটা হলেও নজর রাখতেন। বর্তমান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ভাষ্য অনুসারে রক্তশোষকের থেকেও খারাপ। আগেই বলা হয়েছে, এরা নিজেদের লাভের অঙ্ক বাড়ানোর জন্য শ্রমিকদের অভুক্ত প্রায় করে রাখতে কোনোরকম দ্বিধাবোধ করে না। তাদের এই অবস্থান এমনিতে মারাত্মক; মক্কা মদিনার মতো পবিত্রতম স্থানের সাপেক্ষে তো রীতিমতো ঘৃণ্য।

আমাদের দেশে শ্রমিকমাত্রেরই ছুটি আছে; সপ্তাহে অন্তত একদিন। এখানে এমন সাপ্তাহিক ছুটির ধারণা বলবৎ নয়। বিশেষ কারণে কেউ ছুটি করতে পারে, তবে ওই ছুটির পরিমাণ সামান্য ও অতিরিক্ত ছুটি হলেই কেটে নেওয়া হয় বেতন। তুলনায় কিছুটা ভালো অবস্থায় রয়েছেন ওইসব শ্রমিকরা, যারা বিভিন্ন আবাসনে বা দোকানে কাজ করেন। এরা কমবেশি মানবিক পরিবেশে প্রতিপালিত হন। নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে অবসর সময়ে অন্যত্র কাজ করে অতিরিক্ত আয় রোজগারের সুবিধাও তারা উপভোগ করে থাকেন।

এতক্ষণ যাদের কথা বলা হল তারা সবাই প্রায় ভারতীয় উপ মহাদেশ থেকে কাজ করতে গেছে সেখানে। এদের বাইরেও ওদেশে অগণিত শ্রমিক রয়েছে যারা মুখ্যত অফ্রিকা মহাদেশ থেকে আগত এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই আবার সুদানি। এদের অবস্থার কথা যত কম বলা হয় ততই ভালো। অন্যেরা যতই অসুবিধার মধ্যে থাকুক না কেন রাতের বেলায় তারা অন্তত একটা ছাদের নিচে শুয়ে নিদ্রাসুখ উপভোগ করতে পারে। সুদানিদের সে সুযোগও নেই। তারা আক্ষরিক অর্থেই খোলা আকাশের নিচেয় দিনের পর দিন, বছরের পর বছর রাত কাটায়। এদের কোনো স্থায়ী আবাস স্থল নেই। রাষ্ট্রীয় পরিষেবা এরা যা পায় তা ওই টয়লেট-বাথরুম মাত্র। খোলা আকাশের নিচে রাত কাটিয়ে সকালে পাবলিক টয়লেটে বিনা পয়সায় প্রাত:কৃত সেরে সস্তার কোনো হেটেলে খাওয়া দাওয়া করে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া এদের নৈমিত্তিক বিষয়।

আরব দেশে যেভাবে শ্রমিক-জীবন অতিবাহিত হয় তা নিয়ে আমাদের আলাদা করে মাথা ব্যথা না হতেই পারতো যদি না ওদেশের নাগরিকরা অবিশ্বাস্য ঐশ্বর্য ও বৈভবের মধ্যে প্রতিপালিত হতেন একদিকে এই প্রবল বৈষম্য। অন্যদিকে ইসলামের মহান আদর্শ: অর্থনৈতিক স্যামোর সুদৃঢ় বিধান। আদর্শ ও বাস্তবের বিভিন্নতা সতত পীড়িত করে। একজন ইমানদার হিসেবে নিয়ত দগ্ধ হচ্ছি আমরা।

ক্যানসারের রক্তচক্ষু এখন আরও রক্তাক্ত

বিজ্ঞানের এই জয় জয়কারের দিনে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে সত্যিই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছেন; কিন্তু সব ক্ষেত্রে যে নয় ক্যানসার তার প্রমাণ। আজও এই মারণ রোগের কবল থেকে মুক্তি নেই আমাদের। প্রতিদিন আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ এর শিকার হচ্ছেন, নিতান্ত অকালে ঝরে যাচ্ছে সহস্র সহস্র প্রাণ। অনেক ভাবে, অনেক করে চিকিৎসা চালিয়েও শেষরক্ষা করা যাচ্ছে না। আর ক্যান্সারের এই প্রকোপ সবচেয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে আমাদের এই বঙ্গদেশে। কলকাতার ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে তো বটেই। চেন্নাই বা মুম্বই এর মতো হসপিটলেও বাঙালিদের ভিড় উপচে পড়ছে: তুলনায় দেশের অপরাপর অঞ্চলের অধিবাসীদের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু কেন? সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলার নয় নিশ্চই। তবে সম্ভাবনা-সূত্র অনুসরণ করে বেশ কিছু কথা বলা যেতেই পারে।
বাঙালিদের যে জীবনাচরণ ও খাদ্যাভাস তার মধ্যেই ক্যান্সারের বীজ উপ্ত থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। শরীর-সচেতনতা; শরীরকে সুস্থ-সবল রাখার জন্য যে শারীরিক ক্রিয়াশীলতা আবশ্যক, বাঙালিদের মধ্যে তার তীব্র অভাব রয়েছে। নিয়ম মেনে নিয়মিত ভাবে শরীর চর্চা করেন, বাঙালি সমাজে এমন মানুষের সংখ্যা দুই-থেকে পাঁচ শতাংশও হবে না হয়তো। কেবল নিয়মিত শরীর চর্চা করাতে বাঙালিদের অনীহা রয়েছে শুধু তাই নয়, অনিয়ম রয়েছে আরও নানা ক্ষেত্রে। অতিরিক্ত রাত জাগা, সকালের দিকে অনেকটা সময় যাবৎ বিছানায় থাকা, এসব বাঙালির নৈমিত্তিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এমন সব অভ্যাস ক্যান্সারের চারণ ক্ষেত্রকে উর্বরতর করে তোলে বলে মনে হয়। তবে এও বাহ্য। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল খাদ্যাভাস। বাঙালিরা সাধারণভাবে যে ধরণের খাদ্য-খাবারে অভ্যস্ত এবং দিনে দিনে আরও সে সব খাবারের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে, তা ক্যান্সারকে আবাহন করে আনার জন্য যথেষ্ট।
মাছে ভাতে বাঙালি, এ তো চিরন্তন কথা। খাল বিল, নদী-নালার দেশ বঙ্গদেশে মাছের প্রাচুর্য রয়েছে প্রথমাবধি। আমাদের খাদ্য তালিকায় মাছ তাই বরাবরই উপরের দিকে থেকেছে। কিন্তু এখন অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। নদী-নালায়, খালে-বিলে আর মাছ মিলছে না সেভাবে; এদিকে মাছের চাহিদা কিন্তু রয়েই গেছে। অর্থাৎ বেশ একটা ঘাটতি তৈরি হয়েছে। এই ঘাটতি পূরণ করার জন্য বিকল্প যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে তার প্রত্যেকটিই অত্যন্ত ঝুঁকি বহুল। এখন মাছের চাহিদার সিংহভাগ পূরণ করা হয় অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে মাছ আমদানি করে। প্রথমত, এই মাছগুলো ওখানে যে পদ্ধতিতে প্রতিপালন করা হয় তা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। মাছের অতি বৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করতে যে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার সবই প্রবল ঝুঁকিবহুল। দ্বিতীয়ত, যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মাছ সররক্ষণ ও তা বাজারজাত করা হয় তা আরও বিপজ্জনক। এক্ষেত্রে এক একটি মাছকে জল থেকে তোলা ও তা উদরস্থ হওয়ার মাঝে অতিক্রান্ত হয় কমবেশি এক মাস। এই দীর্ঘ সময় মাছগুলিকে সংরক্ষণ করার জন্য ফর্মালিন থেকে শুরু করে আর যা কিছু ব্যবহার করা হয় তার প্রত্যেকটি মানব শরীরের পক্ষে বিষবৎ। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আমদানি করা মাছ যতটা অস্বাস্থ্যকর ঠিক ততটা না হলেও সমস্যা রয়েছে রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন জলাশয়ে যেসব মাছ উৎপন্ন হচ্ছে সেখানেও। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে মাছের উৎপাদন এখন নেই বললেই চলে। প্রজনন, প্রতিপালন বর্ধন সবেতেই এখন কৃত্রিমতার ছড়াছড়ি। অতি অল্প সময়ে মাছের বৃদ্ধিকে মাত্রাতিরিক্ত করার জন্য হরমন ইনজেক্ট করা থেকে শুরু করে কী না করা হচ্ছে আজ। কেবল মাছ কেন, মাংস, দুধ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মাংস মানে এখন মোটের উপর চিকেন। বিফ সকলের ভক্ষ্য নয়; আর নিয়মিতভাবে মাটন কেনার সামর্থ্য রয়েছে আমাদের মধ্যে খুব কম জনেরই। চিকেনই তাই অবিকল্প বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে এগুলি যেভাবে উৎপাদন করা হচ্ছে তার সবটা অবহিত হওয়া হলে চিকেন ভক্ষণ করার আহ্লাদ বিনষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা হচ্ছে না। আমরা সচেতনভাবে জায়মান বাস্তবতা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখছি এবং নির্বিকারভাবে ডুবে থাকছি চিকেন প্রীতিতে।
একটা সময় ছিল যখন আমাদের ঘরে ঘরে নিয়মিতভাবে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল এসব নিবিড়ভাবে প্রতিপালিত হত। দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণ হত সেখান থেকে। তখন থাকতো পুকুর ভর্তি মাছ। উৎসবে, অনুষ্ঠানে বাজার থেকে মাছ কিনে আনার ব্যাপার ছিল না সেভাবে। পারিবারিক পুকুর থেকে দুই থেকে দশ কেজি ওজনের মাছ সংগৃহীত হওয়া ছিল একেবারে জলভাত। এখন এসবের কিছুই অবশিষ্ট নেই। শহর বা শহরতলীতো বটেই; গ্রামাঞ্চলেও হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল প্রতিপালন নেই বললেই চলে। সবই সংগ্রহ করা হয় বাজার থেকে; নগদ মূল্যে; যার সবটাই প্রায় উৎপাদন করা হচ্ছে, অস্বাস্থ্যকর পন্থায়। এখন পারিবারিক পুকুরের ধারণা উবে গেছে। পুকুরগুলি বছর চুক্তিতে লিজ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অতঃপর গৃহস্থ মাত্র বাজার থেকে মাছ কিনে খাচ্ছেন। গ্রামে এখন স্বাবলম্বী কোনো কৃষকের দেখা মেলা ভার। অথচ এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত, কৃষক তার একটা একটা জমিকে এমনভাবে ব্যবহার করতেন যাতে তার পারিবারিক চাহিদা পূরণ হয়ে যায়। ধানের সময় ধান, পাটের সময় পাট, আর অন্য সময়ে একই জমিতে বিভিন্ন রকমের সবজি ফলানো ছিল সহজাত বিষয়। এখন কৃষক চাষবাস করছেন পারিবারিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে নয়; কিসে আরও বেশি নগদ টাকা হাতে আসবে তাকে টার্গেট করে। এতে হাজারও সমস্যা হচ্ছে। বাজার থেকে আমরা যেসব সবজি সংগ্রহ করছি তার অধিকাংশ উৎপাদিত ও বাজারজাত হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়ায়। মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার এখন নিয়মিত বিষয়। এবং এখানেই শেষ নয়। বাজারজাত করার সময়ও ব্যবহার করা হচ্ছে নানা রকমের কেমিক্যাল; সবজি মালের দেখনদারিত্ব বাড়ানোর জন্য। এইসব কীটনাশক ও কেমিক্যাল সতত আমাদের শারীরিক সমস্যা তৈরি করছে; বিনষ্ট করছে শরীরের অন্তরঙ্গ গঠনকে, আর এসব কিছু সূত্রেই সম্প্রসারিত হচ্ছে ক্যান্সারের মতো মারণ রোগের সীমানা। ফাস্ট ফুড আমাদের খাদ্যাভাসের আর এক কালো অধ্যায়। চাউমিন, পিজ্জা, এসব তো রয়েছেই; তার সঙ্গে নানা রকমের ঠান্ডা পানীয়, চিপস, চকলেট প্রভৃতির বাজারও দিনে দিনে আরও গরম হচ্ছে। নিয়মিত ব্যবধানে বাজারে আসছে নতুন নতুন সব প্রোডাক্ট। মানুষ হুড়মুড়িয়ে অগ্রসর হচ্ছে সেদিকে। এই সব খাদ্য-খাবারের প্রত্যেকটি কোনো না কোনো ভাবে নানাবিধ মারণ রোগের ক্ষেত্রকে উর্বর করছে। ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা দখল করে রয়েছে চিপস ও চকলেটের বাজার। ছোটোদের শরীরের উপর এগুলির ক্ষতিকারক প্রভাব অপ্রতিরোধ্য।
এখন কথা হল, এসব থেকে পরিত্রাণ কোন পথে? না কি কোনো পরিত্রাণ নেই। নিশ্চই আছে। তবে তার জন্য সক্রিয় হতে হবে সম্ভাব্য সব পক্ষকে এবং সর্বাত্মকভাবে। সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব নিতে হবে প্রশাসনকে। শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক এমন সব খাদ্য-খাবার যাতে বাজারে বিক্রির জন্য না আসতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। তার সঙ্গে সংযুক্ত হবে মানুষের সর্বোচ্চ প্রতিবাদী অবস্থান। মানুষ যদি প্রত্যাখ্যান করেন ওইসব খাদ্য-খাবারকে তবে ক্রমান্বয়ে তার উৎপাদন ও যোগান বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। তবে আমাদের মতো বিরাট জনবহুল বিশেষত স্বল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর প্রায় মানুষের দেশে মানুষের মধ্যে সর্বাত্মক সচেতনতা সঞ্চার খুব সহজ নয়; তাই প্রশাসনকেই সবচেয়ে সক্রিয়তা দেখাতে হবে। সমীক্ষা করলে প্রতিপন্ন হবে, আমাদের দেশে খোলা-বাজারে যেসব খাদ্য-খাবার অবাধে বিক্রি হচ্ছে তার সবটাই প্রায় নিষিদ্ধ তালিকা ভুক্ত হওয়ার যোগ্য, প্রথম বিশ্বের যে কোনো দেশে। স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্যাভ্যাসে রপ্ত হওয়া, দৈনন্দিন জীবনাচারে বেশ কিছু পরিবর্তন আনার মধ্যে দিয়ে ক্যান্সার সহ যে কোনো মারণ রোগকে অনেকাংশে প্রতিহত করা খুবই স্বাভাবিক। এখন তাই অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্বাত্মক সচেতনতা। এই সচেতনা শুধু আমাদের নয়: আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও অতি জরুরি।

এখন মাছের চাহিদার সিংহভাগ পূরণ করা হয় অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে মাছ আমদানি করে। প্রথমত, এই মাছগুলো ওখানে যে পদ্ধতিতে প্রতিপালন করা হয় তা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। মাছের অতি বৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করতে যে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার সবই প্রবল ঝুঁকিবহুল। দ্বিতীয়ত, যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মাছ সররক্ষণ ও তা বাজারজাত করা হয় তা আরও বিপজ্জনক। এক্ষেত্রে এক একটি মাছকে জল থেকে তোলা ও তা উদরস্থ হওয়ার মাঝে অতিক্রান্ত হয় কমবেশি এক মাস। এই দীর্ঘ সময় মাছগুলিকে সংরক্ষণ করার জন্য ফর্মালিন থেকে শুরু করে আর যা কিছু ব্যবহার করা হয় তার প্রত্যেকটি মানব শরীরের পক্ষে বিষবৎ।

এ টি এম সাহাদাতুল্লাহ
সহকারী অধ্যাপক, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইভিনিং কলেজ

চিকিৎসা

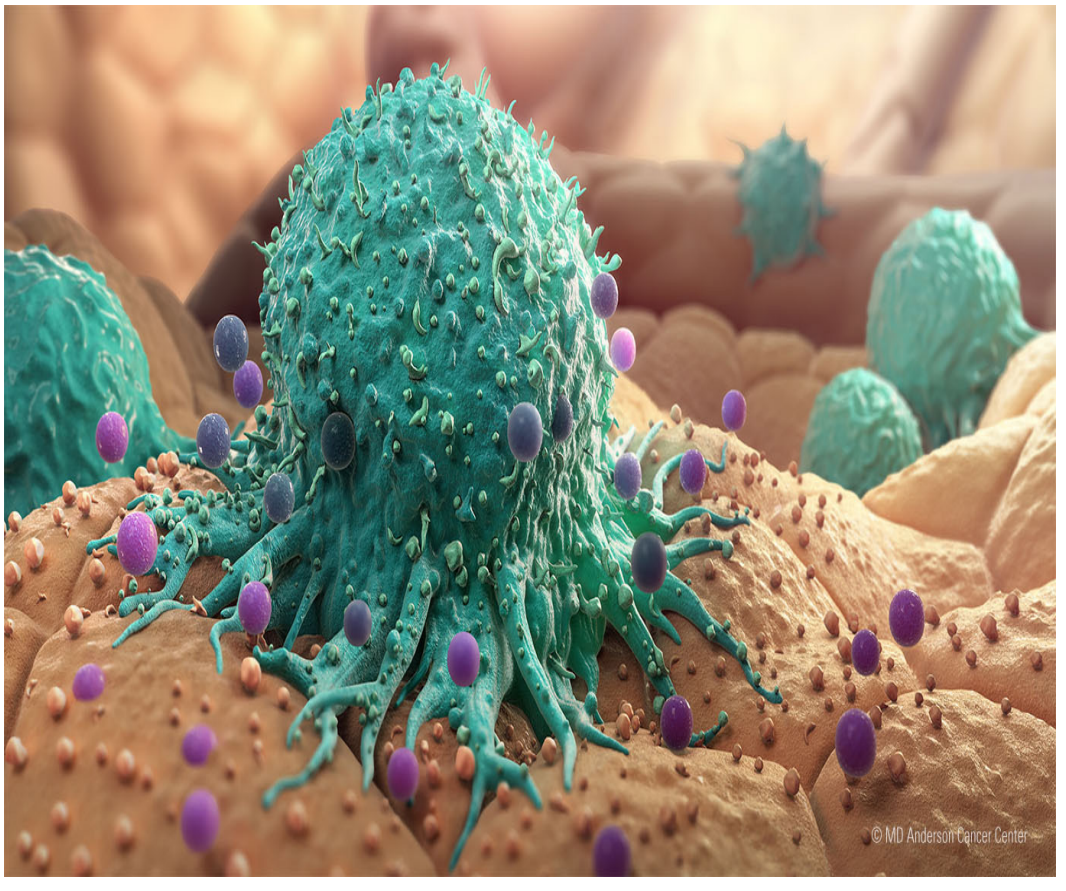

প্রসঙ্গ: বিট্রিশ ইন্ডিয়া লাইব্রেরি

কিছুদিন আগের কথা। আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার সাপেক্ষে বেশ একটু সুনাম আছে এমন এক পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সম্পাদক মহাশয় একদিন একটি অজানা নম্বর থেকে ফোন পান। অপর প্রান্ত থেকে বলা হয়, তারা তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার প্রাপ্তিযোগ্য সমস্ত সংখ্যা সংগ্রহ করতে চান। এই নিবেদনের পরে কেটে যায় বেশ কয়েক বছর। উক্ত ব্যক্তি বা সংস্থার পক্ষ থেকে আর কোনো যোগাযোগ করা হয়নি। সহসা তারা আবারও একদিন ফোন করেন এবং যথারীতি একই নিবেদন রাখেন। অর্থাৎ তারা তাদের পত্রিকা সংগ্রহ করতে চান। সঙ্গতভাবে সম্পাদক মহাশয় এর পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয়, এর আগেও তারা একই কথা বলেছিলেন এবং তারপরে আর কোনো যোগাযোগ করা হয়নি। অতঃপর ওপ্রান্ত থেকে বলা হয়—সত্যিই তাই; আসলে তার দরকার হয়নি; আমরা আমাদের এজেন্টকে দিয়ে আপনাদের সব সংখ্যা সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম, তাই নতুন করে যোগাযোগ করিনি। এখন তারা সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করতে চাইছেন।

এক্ষেত্রে নেপথ্য বৃত্তান্ত ছিল এইরকম- আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে এইসব পত্রিকা; তাদের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের জন্য। তারা বিশেষ প্রকল্প হাতে নিয়েছেন; পৃথিবীর সর্বত্র আঞ্চলিক ইতিহাস নির্ভর যে চর্চা হচ্ছে তার ইতিহাস তারা নথিবদ্ধ করে রাখবেন। প্রকাশিত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট যেসব বই ও পত্র-পত্রিকা; তা তারা সংগ্রহ করে সংরক্ষিত রাখছেন তাদের সংগ্রহশালায়। তা সে যে ভাষার হোক না কেন। আগামী দিনে এ বিষয়ে যাতে সর্বাত্মক গবেষণা সম্পন্ন করা যেতে পারে। এটাই তাদের মূল লক্ষ্য।

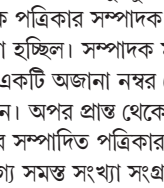

আনোয়ার সাদাত হালদার

সহকারী অধ্যাপক, সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, চর্যাপদ এর শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল, এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে। বক্তাদের মধ্যে আরও অনেকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও; যিনি তখন মুখ্যত দেশের বাইরে থাকতেন। তিনি তাঁর কথাসূত্রে প্রসঙ্গত জানান, কিছুদিন আগে তাকে এই চর্যাপদ বিষয়ে বিদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বলতে হয়েছিল যেখানে তিনি তখন কর্মরত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবকে তিনি কোনোভাবেই নাকচ

করতে পারেননি আসলে করার কোনো উপায় ছিল না। তিনি নিজেই জানান, ওদের লাইব্রেরিতে চর্যাপদ বিষয়ে এত বইপত্র রয়েছে, যে এ নিয়ে কথা বলার বা কাজ করার জন্য দ্বিতীয় কোথাও যাওয়ার দরকার হয় না। এমন অবস্থায় কেমন করে, কোন অজুহাতে প্রদত্ত প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

এক্ষেত্রে সত্যরঞ্জন বাবুর কথায় যে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন নেই তার হাজারও প্রমাণ রয়েছে আমাদের কাছে। গত বছর অর্থাৎ দুই হাজার চব্বিশ সালের বইমেলায় শ্রীঅশোক পাল মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের সম্পাদিত রূপে সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ। এক্ষেত্রে তিনি মুদ্রিত গ্রন্থগুলির মূল কপি সংগ্রহ করার জন্য ন্যাশনাল লাইব্রেরি সহ এদেশের সম্ভাব্য সব ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করে ব্যর্থ হয়ে বিট্রিশ ইন্ডিয়া লাইব্রেরির শরণাপন্ন হন এবং কাঙ্ক্ষিত ফললাভ করেন। বিষয়টা একই সঙ্গে লজ্জার, অপমানের ও যন্ত্রণার। বিদ্যাসাগর আমাদের ঘরের মানুষ; তার বর্ণপরিচয় আমাদের কাছে মাতৃদুগ্ধের সমতুল। অক্ষর জ্ঞান থেকে লিখতে পড়তে শেখা, সবই তো বর্ণপরিচয়ের সূত্রে। এমন যে বর্ণপরিচয় তার কোনো প্রামাণ্য কপি সংরক্ষণ করতে পারিনি আমরা। এক্ষেত্রে অবস্থাটা এতটাই সঙ্কটজনক অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, বিদ্যাসাগর রচনাবলী সম্পাদনার সময় মাননীয় সম্পাদকমণ্ডলীকে বলতে হয়েছিল; যে অনেক অনুসন্ধানের পরেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবৎকালে প্রকাশিত বর্ণপরিচয়ের কোনো কপি সংগ্রহ করতে না পেরে তারা বাধ্য হয়েছেন বাজারে প্রচলিত কপি-কে সংকলন ভুক্ত করতে। আমরা জানি বিদ্যাসাগরের জীবৎকালে বর্ণপরিচয়ের প্রথমভাগের ১৫২ টি এবং দ্বিতীয় ভাগের ১৪০টি সংস্করণ বা মুদ্রণ হয়েছিল। অনুমান করা চলে প্রত্যেক সংস্করণে কয়েক হাজার করে কপি মুদ্রিত হয়। অর্থাৎ মোট মুদ্রিত কপির সংখ্যা কয়েক লক্ষতে গিয়ে দাঁড়াবে। এই এতগুলো কপির সবই নিমজ্জিত হয়েছে কালের অতলে কোথাও কেউ আলাদা করে একটি কপিও সংরক্ষণ করেননি। এদিকে ইংরেজ রাজ, যারা আমাদেরকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করতেই অভ্যস্ত ছিলেন তারা বর্ণপরিচয়কে এদেশ থেকে তাদের দেশে বয়ে নিয়ে গিয়ে সযত্নে রক্ষা করেছেন। না, একটি দুটি নয়; বর্ণপরিচয়ের বেশ কয়েকটি সংস্করণ সংরক্ষিত রয়েছে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া লাইব্রেরিতে।

বিদ্যাসাগর আমাদের ঘরের মানুষ; তার বর্ণপরিচয় আমাদের কাছে মাতৃদুগ্ধের সমতুল। অক্ষর জ্ঞান থেকে লিখতে পড়তে শেখা, সবই তো বর্ণপরিচয়ের সূত্রে। এমন যে বর্ণপরিচয় তার কোনো প্রামাণ্য কপি সংরক্ষণ করতে পারিনি আমরা। এক্ষেত্রে অবস্থাটা এতটাই সঙ্কটজনক অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, বিদ্যাসাগর রচনাবলী সম্পাদনার সময় মাননীয় সম্পাদকমণ্ডলীকে বলতে হয়েছিল যে, অনেক অনুসন্ধানের পরেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবৎকালে প্রকাশিত বর্ণপরিচয়ের কোনো কপি সংগ্রহ করতে না পেরে তারা বাধ্য হয়েছেন বাজারে প্রচলিত কপি-কে সংকলন ভুক্ত করতে।

অনেকেই মনে করতে পারেন, বিদ্যাসগর মহাশয়ের বই, তাই সাহেব বাবুরা আলাদা গুরুত্ব দিয়েছিলেন। প্রকৃত বাস্তব কিন্তু মোটেই তা নয়। বর্ণপরিচয়ের মতো নামী অনামী এমন কতশত বই যে তারা সংগ্রহ করে রেখেছেন, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। প্রাজ্ঞ গবেষক সমাজ কোনো বই এর সন্ধান না পেয়ে যখন হতাশ হন তখন শরণাপন্ন হন বিট্রিশ ইন্ডিয়া লাইব্রেরির এবং প্রায়শ ক্ষেত্রে হাসি ফোটে তাঁদের মুখে। সেদিনের বটতলা থেকে তথাকথিত যেসব অদ্ভুত বই প্রকাশিত হত, যা আমাদের ভদ্রসমাজ পড়ে দেখা তো দূরের কথা, স্পর্শ করে দেখতেও ঘৃণাবোধ করতেন, সেইসব বইও তারা সমাদরের সঙ্গে সংরক্ষণ করেছেন। একটা সময় ছিল, যখন বলা হত বিট্রিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। আক্ষরিক অর্থেই তাই। সত্যিই সেদিন বিট্রিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না। তাদের এই যে বিরাট কর্তৃত্ব, তা যে নিছক বন্দুকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, তা উপলব্ধি করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। বিজিত জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে যাদের এতখানি সচেতনতা, নিজেদের সম্পর্কে তাদের যত্নের যে সীমা পরিসীমা ছিল না, তা বলা বাহুল্য। বিষয়টা প্রতিপন্ন হয়েছিল, বঙ্কিমের দৃষ্টিতে। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, সাহেবরা পাখি মারতে গেলেও তার কথা লিখে রাখে: ইতিহাস রচনা করে; কিন্তু বাঙালির কোনো ইতিহাস নাই। নেই তো নেই-ই। এর মধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে আস্ত একটা শতাব্দী এবং তারপরেও আরও অনেক বছর। এতদিনেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। এক্ষেত্রে একটা বিষয়কে সামনে আনলেই চিত্রটা স্পষ্ট হবে।

১৮৬২ থেকে সূত্রপাত হয়েছিল বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগের। অতঃপর নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল তা। সমকালে মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত সমস্ত বই এর বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ থাকতো এখানে। উত্তর স্বাধীনতা পর্বে এমন প্রস্তুত পথ ও উজ্জ্বল ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করতে পারিনি আমরা। এখনও খাতায় কলমে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগের অস্তিত্ব রয়েছে বটে। কিন্তু তার প্রামাণ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়েছে যথেষ্ট মাত্রায়। আবার গ্রহণ করা হয়নি আর কোনো প্রকল্পও; যেখানে বাংলা ভাষা সহ অপরাপর ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত বই ও পত্রপত্রিকার ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে। অথচ এর প্রয়োজনীতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই।

কেবল মুদ্রিত বই ও পত্রপত্রিকার ইতিবৃত্ত নয়; বস্তুগতভাবেও প্রত্যেকটি বিষয়ই অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংরক্ষিত হওয়া জরুরি। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসচর্চার আকর উপাদান হিসেবে পত্র-পত্রিকা অদ্যাবধি অবিকল্প বাস্তব। এদিকে গত দুই শত বছরে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার অতি সামান্যই সংরক্ষণ করতে পেরেছি আমরা। অধিকাংশ বিনষ্ট হয়েছে। প্রাণপাত করেও সেসব পত্র-পত্রিকার একটি কপিও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। অথচ এটা করা মোটেই কঠিন কোনো কাজ ছিল না। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় খুব সহজেই তা করা যেতে পারতো। প্রতিবছর এক একটা মারণাস্ত্র ক্রয় করার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় তার এক হাজার ভাগের এক ভাগও যদি ব্যয় করা যায়, এই লক্ষ্যে, তবে অনায়াসে বিষয়টি নিষ্পন্ন হতে পারে। অর্থাৎ প্রকৃত কোনো বাধা নেই। বাধা যদি কিছু থেকে থাকে সে আমাদের মানসিকতার: অসচেতনতা জনিত। আজ দিন এসেছে এমন মানসিকতার বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার; এমন অসচেতনতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার। যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্যকে আহত করার আগে নিজেকে হেফাজত করা এখন সময়ের দাবি। মনে রাখা জরুরি, সেই দিন বেশি দূরে নয়, যেদিন পরমাণু বোমাও তাৎপর্য হারাবে; তখনও লড়াই হবে তত্ত্ব, তথ্য ও সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের সাপেক্ষে। এই লড়াই এ জিততে হলে আজ আর কিছুতেই ঘুমিয়ে থাকা চলবে না: এখনই কাজ শুরু করতে হবে।

জ্ঞানচর্চা

জীবনীমালা: মোহম্মদ নাসিরউদ্দীন

বরেণ্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবার্গের জীবনী রচনা করার ঐতিহ্য অনেক দিনের। তবে বিধিবদ্ধভাবে জীবনীমালার প্রচলন খুব বেশি দিনের নয়। আমাদের বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এটা আরও সাম্প্রতিককালের বিষয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এর ব্যবস্থাপনাতে 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'-র মধ্যে দিয়ে বিষয়টির শুভ সূচনা হয়। পরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা প্রকাশনা সংস্থা এ বিষয়ে অগ্রসর

আজিজুল হক

গবেষক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

সওগাত-এর ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিষয় মহিলা সওগাত সওগাত-এর পাতায় বরাবরই প্রধান্য পেতেন মহিলা সাহিত্যিকরা। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যাতে স্থান করে দেওয়া হয়েছিল রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন ও মানকুমারী বসু-কে। অতঃপর এই ধারা ক্রম বেগবান হয় অর্থাৎ লেখিকার সংখ্যা বাড়তেই থাকে। তবু তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না সম্পাদক মহাশয়। তাই আলাদা করে মহিলা সওগাতের পরিকল্পনা করেছিলেন। যেখানে থাকবে শুধু মেয়েদের লেখা। সেদিনের প্রেক্ষিতে এমন পরিকল্পনাকে অবিশ্বাস্য বলা হলেও কম বলা হয় এদিকে এমন অবিশ্বাস্যকেও বাস্তবায়িত করে দেখালেন সওগাত সম্পাদক।

অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং সফল হয়েছেন। ঢাকা বাংলা একাডেমী ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির নাম এ প্রসঙ্গে সবিশেষ স্মরণীয়। আলাদা করে স্মরণ করতে হয় ওপার বাংলার কথাপ্রকাশ ও এপার বাংলার পুনশ্চ প্রকাশনের নামও। সম্প্রীতি একই লক্ষ্যে প্রাণিত হয়েছেন আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ কর্তৃপক্ষ। জীবনীমালা শিরোনামে তারা প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেছেন প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে অবিভক্ত বাংলার ও উত্তর সাতচল্লিশ পর্বের এপার বাংলার বরেণ্য মুসলিম ব্যক্তিত্বের জীবনী।

সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন কেন্দ্রিক রচনা খোন্দকার মাহমুদুল হাসান এর 'নেপথ্য-নায়ক মোহম্মদ নাসিরউদ্দীন' তাঁদের প্রথম পদক্ষেপ।

সুলিখিত ও সুনির্মিত একটি গ্রন্থ। ক্রাউন সাইজের। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪০।

জীবনীমালা ধর্মী রচনার সাপেক্ষে যথেষ্ট। হয়তো বা একটু বেশিই। যদি তাই হয়, তাতেও দোষের কিছু নেই। খুবই সুখপাঠ্য। দ্রুত পড়ে শেষ করে ফেলা যায়। সেই অর্থে কোথাও কোনো মেদ নেই। ঝরঝরে ভাষা, আকর্ষণী উপস্থাপন ভঙ্গি, রচনাটিকে অন্য এক মাত্রা দান করেছে উপজীব্য বা উদ্দিষ্ট বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়েছে। একুশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে। আলোচনা-ধারা অগ্রসর হয়েছে জন্ম ও পারিবারিক পটভূমি, কর্মজীবন, পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তুতি, সওগাত প্রকাশ, সওগাতের নবযাত্রা, নারী জাগরণ ও সওগাত, পুরস্কার-সম্মাননা প্রদান, নাসিরউদ্দীন-চর্চা, জীবন সায়াহ্ন এবং মৃত্যু প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে।

নাসিরউদ্দীন লেখক নন; তিনি প্রথমত ও প্রধানত সম্পাদক। মাসিক সওগাত তাঁর সংস্কৃতি মনস্কতার অনন্য নজির। সওগাতের যখন যাত্রা শুরু হচ্ছে তখন বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে সাহিত্যপত্রিকা যথেষ্ট পরিচিত বিষয় তবে তার পরেও মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন বা তাঁর সওগাত-এর চলার পথ মোটেই মসৃণ ছিল না। সমস্যা ছিল মূলত মুসলমান সমাজের দিক থেকে। মুসলমান সমাজে পত্র পত্রিকার প্রচলন হয়েছিল সেই ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে; অর্থাৎ সংবাদ প্রভাকর-এর সমকালে। তবে ওই পর্যন্ত। সেদিনের সংবাদ সভারাজেন্দ্র-র মতো মুসলিম সমাজ পরিচালিত, সম্পাদিত পরবর্তীকালের কোনো পত্রিকাও দাগ কাটতে পারেনি সেভাবে; বিশেষত সাহিত্যপত্রিকা হিসেবে। সওগাত সম্পাদককে তাই নিজের মতো করে সবকিছুকে গড়ে পিঠে নিতে হয়েছিল। লেখকের অভাব, সাহিত্য পত্রিকাকে গ্রহণ ও লালন করার মতো মানসিকতার চূড়ান্ত ঘাটতি; এসব তো ছিলই। পাশাপাশি আরও ছিল চিত্রশিল্পী, উপযুক্ত মুদ্রণ যন্ত্র সহ হাজারও না থাকার দিক। তারই মধ্যে দুঃসাহসকে পাথেয় করে দূর আকাশে পাখা মেলার স্বপ্ন দেখেছিলেন নাসিরউদ্দীন সাহেব। তাঁর এই স্বপ্ন দেখা সফল হয়েছিল; বাস্তবের মাটিতে অসামান্য সম্ভাবনা হয়ে ঝরে পড়েছিল সওগাত: মাসিক সওগাত এর পাশাপাশি সাপ্তাহিক সওগাত, শিশু সওগাত, মহিলা সওগাত প্রভৃতির আলোয় আলোকিত হয়েছিল বাঙালি সংস্কৃতি—এসবই আমাদের জানা।

গ্রন্থকার গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে সওগাত সম্পাদক ও তাঁর এই কৃতি-কথার আলেখ্য রচনা করেছেন।

সামাজিক অবস্থা, পারিবারিক পরিকাঠামো, অর্থনৈতিক সক্ষমতা কোনো কিছুই অনুকূল ছিল না। স্বউপার্জিত সামান্য মূলধনকে অবলম্বন করে যাত্রা শুরু করেছিলেন সম্পাদক মহাশয় এবং সঙ্গতভাবেই জোর হোঁচট খেয়েছিলেন। জমানো মূলধন শেষ হয়ে গেলে সাময়িকভাবে পত্রিকা প্রকাশ স্থগিত রাখতে বাধ্য হতে হয় তাঁকে। অতঃপর পূর্ববর্তী জীবনবীমা ব্যবসায় অবতীর্ণ হয়ে আরও কিছু মূলধন সংগ্রহ করে নতুনভাবে শুরু করা এবং স্বপ্নের উড়ান দেওয়া; যে উড়ানের আর পরিসমাপ্তি হয়নি আমৃত্যু —অদ্বিতীয় এই যাত্রা-কথার বিশ্বস্ত রূপায়ণ রয়েছে এখানে; যা আগ্রহী পাঠককে পরিতৃপ্ত করার জন্য যথেষ্ট বলে মনে হয়।

সম্পাদক নাসিরউদ্দীন এর লড়াই ছিল বহুমুখী। সওগাত এর ধারাকে বহমান। রাখাই সেদিন যথেষ্ট ছিল না। সমাজ-মনকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করে তোলা ছিল তাঁর জন্য সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। ভাই বিশেষভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন সম্পাদক মহাশয়।

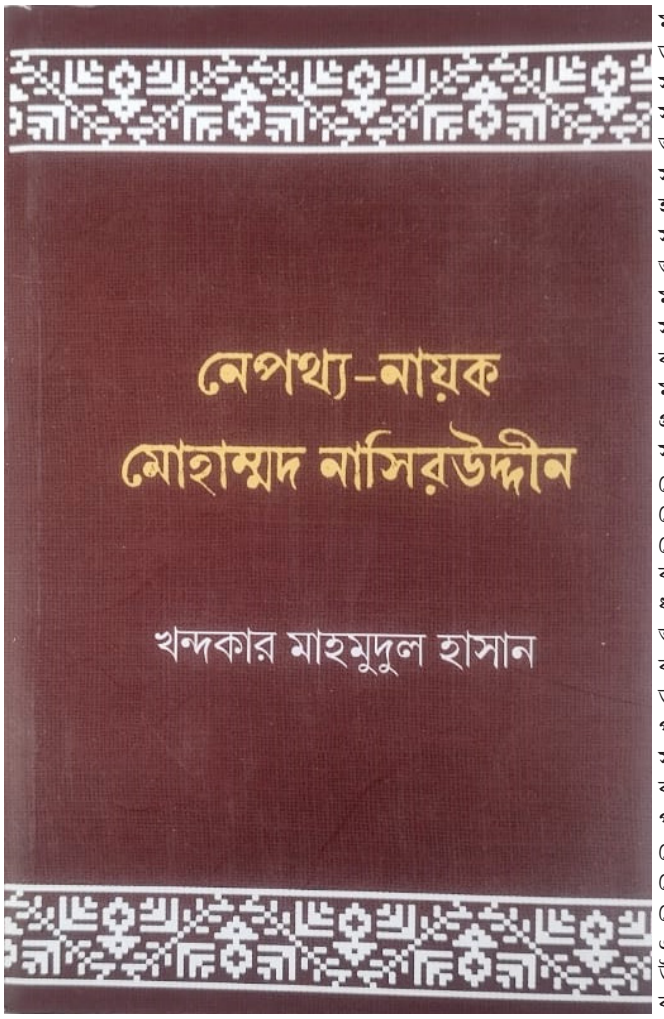

সওগাত-সাহিত্য মজলিশ ছিল এই পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তখন নিয়মিতভাবে নিয়ম করে বসত সওগাত সাহিত্য-মজলিশ। এই মজলিশে সপরিবারে হাজির হতেন সওগাত এর লেখক সম্প্রদায়। সেদিনের প্রেক্ষিতে যা ছিল আক্ষরিক অর্থেই বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ। যারা সওগাত সাহিত্য মজলিশের নিয়মিত সদস্য ছিলেন তাঁদের অনেকেরই তেমন আর্থিক সক্ষমতা ছিল না। সম্পাদক মহাশয়কে তাই অতিরিক্ত দায়বদ্ধতার ভার বহন করতে হতো। সাহিত্য-মজলিশ এর সমস্ত খরচ তিনি একাই মেটাতেন। ততদিনে বাণিজ্যিকভাবে সওগাত বেশ সুবিধাজনক অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। তবু তারপরেও স্বীকার করতেই হবে, এতটা উদারতা প্রদর্শন, এতখানি দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে নেওয়া, মোটেই সহজ ছিলনা।

এক্ষেত্রে যে মন ও মননের তাড়নায় তাড়িত হয়েছিলেন সম্পাদক নাসিরুদ্দীন সাহেব, গ্রন্থকার গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে তার সূত্রসন্ধানে যত্নশীল হয়েছেন।

সওগাত-এর ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিষয় মহিলা সওগাত। সওগাত-এর পাতায় বরাবরই প্রধান্য পেতেন মহিলা সাহিত্যিকরা। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যাতে স্থান করে দেওয়া হয়েছিল রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন ও মানকুমারী বসু-কে। অতঃপর এই ধারা ক্রম বেগবান হয় অর্থাৎ লেখিকার সংখ্যা বাড়তেই থাকে। তবু তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না সম্পাদক সাহেব। তাই আলাদা করে মহিলা সওগাতের পরিকল্পনা করেছিলেন। যেখানে থাকবে শুধু মেয়েদের লেখা। সেদিনের প্রেক্ষিতে এমন পরিকল্পনাকে উদ্ভট বলা হলেও কম বলা হয় এদিকে এমন অবিশ্বাস্য বিষয়কেও বাস্তবায়িত করে দেখালেন সওগাত সম্পাদক। আরও অবিশ্বাস্য যে, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা মহিলা সওগাত প্রকাশিত হয়েছিল কেবলমাত্র মুসলিম মেয়েদের লেখা সমন্বিত হয়ে এবং প্রত্যেকটি লেখার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল লেখিকাদের ছবি। সম্পাদক এর পক্ষ থেকে শর্ত দেওয়া হয়েছিল, শুধু মাত্র তাদের লেখাই মহিলা সংখ্যায় স্থান পাবে, যারা ছবি ছাপাতে অনুমতি দেবেন। তখন মুসলিম লেখিকা সেভাবে নেই বললেই চলে। এরই মধ্যে এমন কঠিন শর্ত। এত কঠিন শর্ত প্রদান ও পত্রিকার রূপায়ণ সেদিন নাসিরউদ্দীন ছাড়া দ্বিতীয় কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। যে অমিত তেজ ও ইচ্ছাশক্তির উপর ভর করে এমন অসাধ্য প্রায় সাধন করা হয়েছিল তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ রয়েছে গ্রন্থ-মধ্যে।

বই পড়া

সওগাত ও তার সম্পাদক এর কাছে আপামর বাঙালি আরও অনেক বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে একটি বিষয় বিশেষ করে ঋণী তা হল নজরুল। নজরুল প্রতিভার লালন পালনে সওগাত এর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। প্রথম দিককার লেখ্য প্রকাশের কথা যদি ছেড়েও দেওয়া হয়: কৃষ্ণনগর পর্বে নজরুলের আর্থিক দুরবস্থার প্রেক্ষিতে সওগাত গোষ্ঠী যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সুরক্ষা দিয়েছিলেন তার তুল্য দৃষ্টান্ত আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে একেবারেই সুলভ নয়। গ্রন্থকার সওগাত ও নজরুল সম্পর্কের এই সমীকরণকে যেভাবে প্রামাণ্য রূপ দিয়েছেন তা পাঠকের জন্য বিশেষ উপরিপাওনা।

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ একটা বড়ো লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে পথচলা শুরু করেছেন। আমাদের কথা অংশে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, এমন অপ্রিয় অবস্থার সূত্রে অনেক কথা উঠে এসেছে। অভিযোগ করা হয়েছে, অগ্রসর সমাজের দিক থেকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়নি সহযোগিতার হাত। এই অভিযোগ অসত্য নয়। আবার এটা শেষ কথাও নয়। নিজেদের দিক থেকেও অনেক কিছু করণীয় থেকে যায়। মুসলমান সমাজ যা কারেনি, বা করার চেষ্টা করেও সম্পন্ন করতে পারেনি। আমরা তাই নতুন করে উদ্যোগী হয়েছি।" বলা বাহুল্য, এমন উদ্যোগ আজ অতি আবশ্যক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কোনো সংস্থাই এপার বাংলার মুসলমান সমাজের ভাবাবেগের সাপেক্ষে তেমন ইতিবাচক অবস্থান নিতে পারেননি। একটা শূন্যস্থান তাই রয়েই গেছে। আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ ও তাদের জীবনীমালা সূত্রে যদি এই শূন্যস্থান কতকাংশে হলেও পূর্ণতা পায়, তবে তা হবে বাঙালি জাতি-সংস্কৃতির সাপেক্ষে অনন্য এক পদক্ষেপ।

দৃষ্টি (প্রস্তাবিত) ট্রাস্টের পক্ষে মীর রেজাউল করিম কর্তৃক ৩৮ ডা. সুরেশ সরকার রোড, পশ্চিম ব্লক (দ্বিতীয় তল), কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে প্রকাশিত। যোগাযোগ : ৮৯০২৪০৮৪২০, ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৪৩২৮৮০২৪২ সম্পাদক: **সাইফুল্লা**।
On behalf of Drishti Trust, Published by Mir Rejaul Karim, Published from 38 Dr. Suresh Sarkar Road(West Block, 2nd Floor), Kolkata-700014, M: 94328800242, 86370864691, 8902408420
Email: samim.saifulla@gmail.com, rafakarimnbu@gmail.com **Editor: SAIFULLA**